আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

মেজর. আই. এন. এ.

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৯

নিবেদন

আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের পর নানা দুঃখকষ্ট সহ্য করে আমি ও আমার সহকর্মিগণ প্রাণভরা আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে ইম্ফল রণক্ষেত্রে উপস্থিত হই। কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে আমাদের বাধ্য হয়ে পিছনে ফিরে আসতে হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী আজ আর দেশবাসীর কাছে নূতন নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতা হয়তো অনেকের ভালো লাগতে পারে সেই আশাতেই নিজের কাহিনী 'দেশ' পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করি।

শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ ও 'দেশ' পত্রিকার অন্যান্য অনেক বন্ধু আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তার জন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টা ও সহানুভূতির জন্যই এই কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হলো। তাঁর ন্যায় মহান্ ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই।

চিত্তরঞ্জন কলোনী
দমদম
১৩৫৪

জয় হিন্দ
লেখক

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

আজ দেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার আজ ২৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এ সময়ে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশন নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি, দেশবাসী এই পুণ্যাদিনটি স্মরণ করে দেশপূজ্য নেতাজী এবং তাঁর সঙ্গীদের সেই বীরত্বপূর্ণ কাহিনী নতুন করে জানবার আগ্রহ প্রকাশ করবেন। জয় হিন্দ—

দেশবন্ধুনগর
কলিকাতা-৫৯

লেখক

জয় হিন্দ

মুক্তিফৌজের যেসব সহকর্মীরা ভারতের
স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগদান করে—
দিল্লীর পথে
'কদম' বাড়িয়েছিল
কিন্তু
পথের ধারে অজ্ঞাতস্থানে আজ
চিরনিদ্রায় নিদ্রিত,
সেই বীর
শহীদগণের
স্মৃতির উদ্দেশে
উৎসর্গীকৃত

আজাদ হিন্দ ফৌজের জাতীয় সংগীত

শুভ সুখ চৈন কী বরখা বরষে ভারত ভাগ হৈ জাগা
পাঞ্জাব সিন্ধ গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
চঞ্চল সাগর বিন্ধ্য হিমালা নীলা যমুনা গঙ্গ
তেরে নিত গুণ গায়,
তুঝ সে জীবন পায়,
সব তন্ পায়ে আশা,
সুরজ বনকর জগপর চমকে ভারত নাম সুভাগা
জয় হো, জয় হো, জয় হো,
জয় জয় জয় জয় হো ॥

সবকে দিল মে প্রীত বসায়ে তেরী মীঠী বাণী
হর সুবে-কে রহনেবালে হব মজ্ হব্-কে প্রাণী
সব ভেদ-ও-ফরক মিটাকে
সব গোদমে তেরী আকে
গুঁথে প্রেম-কী মালা
সুরজ বনকর জগপর চমকে ভারত নাম সুভাগা
জয় হো, জয় হো, জয় হো,
জয় জয় জয় জয় হো ॥

সুবাহ সুবেরে পঙ্ক্ষ্ পখেরু তেরেহী গুণ গায়ে
বাসভরী ভরপুর বায়েঁ জীবন মে রুত লায়ে।
সব মিলকর হিন্দ ফুকারে
"জয় আজাদ হিন্দ কে নারে
প্যারা দেশ হামারা।"
সুরজ বনকর জগপর চমকে ভারত নাম সুভাগা
জয় হো, জয় হো, জয় হো,
জয় জয় জয় জয় হো,
ভারত নাম সুভাগা ॥

॥ ১ ॥

১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরে আত্মসমর্পণের পর উত্তর মালয়ে জাপানীদের সঙ্গে কাজ করছিলাম। সিঙ্গাপুর-ছাড়া হলেও খবরের কাগজ মারফৎ জাতীয় বাহিনীর সব কিছু খবরই পেতাম। কিন্তু বার বার চেটা করেও আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদানের সুযোগ পাইনি। তারপর অনেক চেষ্টার পর ১৯৪৩ সালে নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি আমাদের প্রায় দু'শো পঞ্চাশজনকে জাপানীরা জাতীয় বাহিনীতে যোগদানের জন্য ছেড়ে দেয়। আমরা ইপো থেকে রেলগাড়ি চড়ে সিঙ্গাপুর শহরে এসে পেঁছিলাম। আমাদের আগমনের খবরটা আগে থেকেই জানানো ছিল বলে স্টেশনে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের অনেকগুলি লরী হাজির ছিল। সেখান থেকে আমরা নীসুন ক্যাম্পে এসে পেঁছিলাম।

এই দলে ডাক্তার আমি একাই ছিলাম। সেখানে দু'দিন থাকার পর ডাক্তার (মেজর) খানের সঙ্গে দেখা। তিনি তখন আজাদ ব্রিগেডের মেডিক্যাল অফিসার। আমাকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন; বললেন, 'আমাদের ব্রিগেডে একজন ডাক্তারের দরকার, তুমি এলে আমরা আনন্দিত হবো।' বৃটিশের সময়ে মালয়ে ডাঃ খানের সঙ্গে বহুদিন কাজ করেছি, মালয়ী ভাষাতে কিছুদিন গুরুগিরিও করেছিলাম, তাই তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। আমার স্বাস্থ্য তখন বিশেষ ভালো ছিল না—কিছুদিন বিশ্রামের দরকার; সেজন্য আমাকে কিছুদিনের জন্য বিদ্যাধরী ক্যাম্পের হাসপাতালে কাজ করার হুকুম দেওয়া হয়।

আমি প্রায় দেড় বছর সিঙ্গাপুর-ছাড়া; কাজেই এদিককার খবর শুধু কাগজেই পড়েছিলাম, কাজের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলাম না। এখানকার হাসপাতালে বহু পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা হলো, তাঁরা বহুদিন পরে আমাকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন। ডাঃ জ্ঞান দাশগুপ্ত ও ডাঃ আসাদউল্লার সঙ্গে একই জাহাজে মালয়ে এসেছিলাম—তাঁরা দু'জনেই এখানে কাজ করছেন। হাসপাতালের 'সি-ও' ছিলেন তখন মেজর জগদেও সিং। আমি জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করলেও আমার নাম গেজেটেড হয়নি, সেজন্য আজাদ হিন্দ ফৌজের কোনও ব্যাজ বা 'র‍্যাঙ্ক' ব্যবহার করতাম না।

প্রয়োজনমত ডাক্তার ছিল না, তাই এখানে সিভিলিয়ান ড্রেসারদের জন্যে একটি ট্রেনিং সেণ্টার খোলা হয়েছিল। পঁচিশ-ত্রিশজন বাঙালী ও মাদ্রাজী ড্রেসার তখন এখানে ট্রেনিং পাচ্ছিল। ট্রেনিং পাশ করার পর তাদের সাব-অফিসারদের পদ দেওয়া হচ্ছিল। এ সমস্ত ড্রেসারদের পুঁথিগত বিদ্যা বেশী না থাকলেও হাতে-কলমে কাজ এরা বেশ ভালোই জানে, কারণ মাঝখানে এদের প্রত্যেকেই কোন না কোন হাসপাতালে পাঁচ-সাত বছর কাজ করেছে। এরা ছাড়া 'ঝান্সীর রাণী' রেজিমেন্টের কয়েকটি মেয়েও নার্সিং শিক্ষার জন্য রোজই হাসপাতালে আসতেন। তাঁরা প্রত্যেকেই শিক্ষিতা, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। শেখবার জন্য তাঁদের ছিল অদম্য স্পৃহা। সেবার জন্য তাঁরা প্রাণপাত করতেন। তাঁদের সুন্দর অমায়িক ব্যবহারে ডাক্তার এবং রোগী প্রত্যেকেই তাঁদের উচ্চ প্রশংসা করতেন। পরে এ'দের মধ্যে অনেকেই অসীম কর্মদক্ষতা দেখিয়েছেন।

বিদ্যাধরী হাসপাতালে মাত্র দশদিন কাজ করেছি, তারপরই বদলি হলাম 'তিন নম্বর গেরিলা রেজিমেণ্টে'। এটি 'আজাদ ব্রিগেড' নামে বিখ্যাত ছিল। এখানে যে বদলি হবো তা আগে থেকেই জানতাম, কারণঃ এখানে ডাক্তার একজন কম ছিল, আর শীঘ্রই এ রেজিমেণ্টের 'ফ্রণ্টে' যাবার কথা।

১৯৪৩ সালের ২৮শে নবেম্বর আমি সিঙ্গাপুর থেকে জহোর বারু এসে নিজের

রেজিমেণ্টে যোগ দিলাম। এই রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডিং অফিসার ছিলেন তখন কর্নেল গুলজারা সিং এবং দ্বিতীয় কম্যান্ড ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত হকি খেলোয়াড় মেজর গুরমিথ সিং। দু'জনেই অতি অমায়িক প্রকৃতির। আমি এক নম্বর ব্যাটেলিয়ানের মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হলাম। আমি ছাড়া দু' নম্বর ব্যাটেলিয়ানে ছিলেন লেঃ মন্মথ দে চৌধুরী ও তিন নম্বর ব্যাটেলিয়ানে লেঃ প্রশারকর নামে একজন মারাঠী ডাক্তার। চৌধুরীকে আগে থেকেই জানতাম। লক্ষ্ণৌতে আমরা এক সঙ্গেই ট্রেনিং নিই। প্রশারকরের নাম শোনা থাকলেও এই তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ। আমাদের চেয়ে তাঁর বয়স কম; সুন্দর, বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান।

বৃটিশের সময় থেকেই এখানে সুন্দর কংক্রিটের কয়েকটি ব্যারাক তৈরি হয়েছিল সৈন্যদের থাকার জন্য। আমরা সেইগুলিই অধিকার করেছি। অনেকগুলি ব্যারাক আছে যাতে কম করে চার পাঁচ হাজার সৈন্য থাকতে পারে। আমাদের রেজিমেণ্ট ছাড়াও তখন ছিল এন্-সি-ও ট্রেনিং সেণ্টার, রি-ইন্ফোর্সমেণ্ট ও বাহাদুর গ্রুপ। কিছুদিন পরে লেঃ দেবেন গাঙ্গুলী এসে জোটেন। কাজেই আমাদের কয়েক জন ডাক্তারের সময় বেশ ভালোভাবেই কাটতো। যুদ্ধের আগে জহোরের সুলতান এখানে একটি বিরাট হাসপাতাল তৈরী করেন। এটি পূর্ব এশিয়ার শ্রেষ্ঠ হাসপাতাল। বর্তমানে জাপানীরা সেখানে তাদের মিলিটারী হাসপাতাল করেছে।

জহোর বারু ছোট জায়গা হলেও আমরা বেশ আমোদেই এখানে দিন কাটাতাম। ক্যাম্পের কাজ দুপুর বারোটার মধ্যেই শেষ হতো। আমরা দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিয়ে দল বেঁধে সান্ধ্যভ্রমণে বেরুতাম। মাঝে মাঝে বাঙালী প্রথায় মুখ বদলাবার জন্য হাজির হতাম স্থানীয় পুলিশ সার্জন ডাঃ সন্তোষকুমার মিত্রের গৃহে। তিনি পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে সপরিবারে থাকতেন। আগেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁর বাড়িতে যাবার পথে ট্রেনিং স্কুলের গেটে মালয়ী পুলিশ প্রহরী থাকতো। জাপানীদের হুকুমমতো সেই গেট দিয়ে যারা যাবে তাদের মাথা ঝুঁকিয়ে প্রহরীকে সেলাম দিতে হবে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সম্মান জাপানী-দের সমপর্যায়ের ছিল, কাজেই আমরা গেলে তারাই আমাদের মিলিটারী প্রথায় সেলাম জানাতো।

বাঙলা থেকে বহুদূরে এই সুন্দর মালয়ে ডাঃ মিত্রের বাড়িতে আমরা যে স্নেহ পেয়েছি তা বাড়ির মা-বোনের চাইতে কোন অংশে কম তো নয়ই, বরং বেশী। মনে পড়ে শরৎবাবুর লেখা—"ঘর ছাড়িয়া আসিলে কি হইবে, প্রত্যেক বাঙালী বাড়িতে যে মা-বোনেরা ছড়ানো আছে, সাধ্য কি এদের স্নেহের অত্যাচার ছাড়িয়া কোথাও যাই।" ডাঃ মিত্রের বড় ছেলে প্রশান্ত তখন আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেছে, আর, শুনলাম শীঘ্রই ট্রেনিং-এর জন্য সে টোকিও যাবে। ডাঃ মিত্রও নোটিশ দিয়েছেন, সিভিল থেকে ছাড়া পেলেই তিনি যোগদান করবেন। এক্ষেত্রে বোধহয় এটুকু বললে বাহুল্য হবে না যে, ডাঃ মিত্র নেতাজীর সহপাঠী আর তাঁর স্ত্রী অনশনব্রতী যতীন দাসের ভগ্নী। এইজন্যই নেতাজী এই পরিবারটিকে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। মেয়ে লক্ষ্মীও 'ঝান্সীর রাণী' বাহিনীতে যোগ দেবার জন্য তৈরী ছিল, কিন্তু বাবা ও দাদা উভয়ে যোগ দেওয়াতে মা নিতান্ত একা পড়বেন বলেই তার পক্ষে যোগদান সম্ভব হয়নি।

১লা ডিসেম্বর আমার নাম আজাদ হিন্দ ফৌজের লেঃ হিসাবে গেজেট-ভুক্ত হয়। ডিসেম্বরের প্রায় শেষ পর্যন্ত আমরা জহোর বারুতে ছিলাম। আমাদের সৈন্যরা যখন প্যারেড শেষ করে খালি গায়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে গান গাইতে গাইতে ক্যাম্পে ফিরে আসতো তখন তাদের প্রাণের মাঝে জেগে উঠতো অসীম আশা ও আনন্দ। তাদের সুন্দর স্বাস্থ্য, প্রাণভরা উৎসাহ, দেশের জন্য জীবনপণ দেখে মনে হতো এরাই প্রকৃত মানুষ। মানুষ বলে পরিচয় দেবার অধিকার আছে শুধু এই বীর সৈন্যদের। গোলামের জাত বলে চিরদিন সব দেশেই সকলেই আমাদের ঘৃণা করে। আজ আমরা গর্বোন্নত মস্তকে ঘুরে বেড়াই। প্রায় তিন হাজার বছরের স্বাধীনতাভোগকারী জাপানীদের যা সম্মান যা ক্ষমতা, মাত্র কয়েকমাসে গঠিত আমাদের গভর্ণমেণ্টেরও আজ সেই সম্মান সেই ক্ষমতা। বহুবার বহু

বক্তৃতাতে আমাদের সৈন্যদলকে জানানো হয়েছে, "তোমরা এখন স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের দেশমাতৃকার প্রকৃত স্বাধীন সৈন্যদল। বুক ফুলিয়ে রাস্তা চলবে, কারো কাছে মাথা নত করবে না। পরস্পরকে উন্নত মস্তকে 'জয় হিন্দ' বলে অভিবাদন করবে, মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান কাউকেও দিও না। 'জয় হিন্দ' অভিবাদনের মধ্যে ফুটে উঠেছে অখণ্ড ভারতের বন্দনা গান। ভুলে যাও, তুমি হিন্দু, মুসলমান ও শিখ। শুধু মনে রেখো তুমি ভারতবাসী, তোমার মা আজ শৃঙ্খলিত। সেই শৃঙ্খলিতা চিরবন্দিনী মা'র মুক্তির জন্যই আজ তোমার সাধনা"।—পূর্ব এশিয়ার প্রায় তিন লক্ষ ভারতীয় এই বাণী দেবতার আদেশের মতো গ্রহণ করেছে; প্রকৃত স্বাধীনতা যে কী, সেদিন তা অনুভব করেছি। সেদিন বুঝতে পেরেছি স্বাধীনতার কী আনন্দ!

আমাদের রেজিমেণ্টে অনেক সিভিলিয়ান সিপাহী ছিল, তারা প্রায় সকলেই তামিল ভাষায় কথা বলে। হিন্দুস্থানী তারা ভালো করে জানতো না, কাজেই অন্যান্য ডাক্তাররা তাদের নিয়ে বিপদে পড়লেও আমার বড় বেশী অসুবিধা হতো না, কারণ অনেকেই মালয়ী ভাষা জানতো। সকালে ও সন্ধ্যায় হাজিরা দেওয়ার সময় জাতীয় সংগীত গান হতো। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ-মন-অধিনায়কে'র হিন্দী তর্জমা। ভোরবেলা অনেক সময় শুনতাম আমাদের এই জাতীয় সংগীত, "সুবা সুবেরে পংখ পাখেরু তেরেহি গুণ গায়"। সমবেত কণ্ঠের সে সংগীত কী অপূর্বই না শোনাতো!

ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে আমরা এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে রওনা হলাম পেরাক রাজ্যের টাইপিঙ শহরে। জহোর বারু থেকে সোজা স্পেশ্যাল ট্রেন। পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে বিদায় নিলাম। ডাঃ মিত্র সপরিবারে আমাদের গাড়িতে তুলে দিতে এসে-ছিলেন। এগিয়ে চলেছি আমরা ক্রমশ রণক্ষেত্রের দিকে। আপন বলতে এখানে কেউ নেই, তবু যাবার সময় প্রবাসে এই আত্মীয়তার, স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে যেতে মন যেন কাতর হয়ে পড়ে। ঘর তো ছেড়েছি বহুদিন, তবু বাইরের মায়া আজ যেন ঘরের চেয়ে বেশী। রাত প্রায় একটায় গাড়ি ছাড়লো। গাড়িতে আরাম করে যাবার মতো জায়গা ছিল না। কোন রকমে বসে যাবার মতো জায়গা পাওয়া গিয়েছিল। আমাদের সংগে জেমস্ নামে এক নূতন সিভিলিয়ান অফিসার ছিল। অফিসার ট্রেনিং স্কুল থেকে পাশ করে আমাদের ব্যাটেলিয়ানে প্ল্যাটুন কম্যাণ্ডার হয়ে এসেছে। বয়স খুবই কম। হয়তো কুড়ি বা একুশ মাত্র হবে। অফিসারজনোচিত গাম্ভীর্য না থাকায় আর একটু শিক্ষিত হওয়ার জন্য পুরাতন অফিসাররা তাকে বিশেষ ভালো চোখে দেখতেন না, কাজেই বেচারা আমার কাছেই বেশী সময় কাটাতো। সারারাত আমরা দু'জনে নানা গল্প গুজবে আনন্দে কাটিয়ে দিতাম।

আমরা টাইপিঙ-এ এসে পেঁছিলাম। ছোট্ট শহর। মালয়ের অন্যান্য শহরের মতন সুন্দর ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। পাশেই পাঁচ হাজার ফুট উঁচু 'ম্যাকসুয়েল' পাহাড়। তার পাশে একটি কৃত্রিম হ্রদ শহরের শোভা বর্ধন করছে। থাকবার জন্য এখানে বেশ ভালো জায়গা পেয়েছি।

টাইপিঙ শহর মালয়ের একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। আমাদের অভিযান-পর্বের এটি হচ্ছে প্রথম অধ্যায়। পাশেই পাহাড়। কাজেই জংগলের যুদ্ধ 'গেরিলা'-পদ্ধতি শিক্ষার পক্ষে এটি বেশ উপযুক্ত স্থান। সপ্তাহে একদিন 'রুট মার্চ' তো বাঁধাই ছিল—তা ছাড়া 'নাইট মার্চ' ও অন্যান্য নানা স্কীমও প্রায় প্রতিদিনই লেগে থাকতো। আমি নিজে কয়েকদিন এদের সংগে কুড়ি থেকে চব্বিশ মাইল পর্যন্ত মার্চ করেছি। ম্যাকসুয়েল পাহাড়ের উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুট। রাস্তা দিয়ে উপরে উঠতে ঠিক পাকা নয় মাইল। স্কীমের জন্য আমাদের এ পাহাড়ে প্রায়ই যাতায়াত ছিল। বিশেষ করে কর্নেল সাহেবের হুকুম যে, অন্তত একবার সকলকেই পাহাড়ে উঠতে হবে, তা সে যেই হোক না কেন। উপরে দু'তিনখানা সুন্দর বাড়ি আছে, অবশ্য যাত্রীদের জন্য। উপরে খুব বেশী ঠাণ্ডা। আমরা বাড়ি পর্যন্ত পেঁছিতে তো একেবারেই গলদ্ঘর্ম, কিন্তু পাঁচ মিনিট কাটতে না কাটতেই ভীষণ ঠাণ্ডা, কাজেই যথাশীঘ্র প্রত্যাগমন। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে যাচ্ছে একটি ঝরণা।

সকালে রোগী দেখার কাজ শেষ করে এখানকার সিভিল হাসপাতালে যেতাম। একজন

চীনা ছাড়া আর সবাই ভারতীয় ডাক্তার। মাঝে মাঝে নিজেদের কঠিন রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করতাম, হাতে কাজ না থাকলে হাসপাতালের কাজেও সাহায্য করতাম। বলা বাহুল্য, এখানে আমাদের নিজস্ব কোনও হাসপাতাল ছিল না। ডাক্তাররা সবাই আমাদের যথেষ্ট ভালোবাসতেন ও সব রকম সাহায্য করতেন।

সারা মালয়ের ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্যে নব-জাগরণের বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তাদের অনেকেই কাজকর্ম ছেড়ে সর্বস্ব দান করে জাতীয় বাহিনীতে যোগদান করতে শুরু করেছে। এমন কয়েকটি পরিবারকে জানি যাঁরা সর্বস্ব দান করে স্ত্রীপুরুষ সবাই মিলে এই আন্দোলনে যোগদান করেছেন। যাঁদের যোগদান সম্ভবপর হয়নি তাঁরাও নানাভাবে আমাদের সকল কাজে সহায়তা করতেন। প্রত্যেক স্থানের 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' আজাদ হিন্দ বাহিনীর সকল প্রকার সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখতেন। টাইপিঙ-এ আমাদের ঘরের আসবাবপত্র ও সিপাহীদের ডাইনিং-টেবল, বেঞ্চ প্রভৃতি স্থানীয় লীগ থেকে আমাদের দেওয়া হয়েছে। প্রতি গৃহে জাতীয় পতাকা—প্রত্যেকের মুখে সুস্পষ্ট দীপ্ত 'জয় হিন্দ' ধ্বনি আমাদের প্রাণে জাগিয়ে তুলতো অসীম আনন্দ ও অখণ্ড বিশ্বাস। আর সকলের উপরে প্রেরণা দিচ্ছেন আমাদের নেতাজী। নেতাজীকে আমাদের বাহিনী যে কতটা সম্মান দিয়েছে তা বুঝতে পারা যায় শুধু এইটুকু জানালে যে, কেউ কোনও দিন তাঁর নামোচ্চারণ করতো না—'নেতাজী' কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে 'অ্যাটেনশন' হয়ে যেতো সকলেই। এই ভাবে আমরা টাইপিঙ-এ দিন কাটাচ্ছি। এখানে যেমন দিনরাত খুব ট্রেনিং চলেছে, তেমনি খাওয়াও খুব ভালো হতো। রোজ মাথা-পিছু এক পাউণ্ড সবজি, তা ছাড়া রোজই হয় মাছ নয়তো ডিম, সপ্তাহে একদিন মাংস। কাজেই এই স্বাস্থ্যকর স্থানে ভালো খেয়ে ও কঠিন শ্রমসাধ্য কাজ করে প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য খুব উন্নতি লাভ করেছে।

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৪ঃ—আজ ভারতের স্বাধীনতা দিবস। এখানকার মাঠে সভার আয়োজন হয়েছে। জনসাধারণ ও আমাদের সম্মিলিত সভা। আমাদের আজাদ ব্রিগেড ও এক নম্বর ডিভিসন হেড কোয়ার্টার তখন এখানে। বিকালে মিলিটারী ব্যাণ্ডসহ খোলা সঙ্গীন উঁচু করে প্রায় আড়াই হাজার জাতীয় সৈন্য সদর্পে রাস্তার উপর দিয়ে মার্চ করে মাঠের দিকে রওনা হলো। প্রত্যেক ব্যাটেলিয়ানের সঙ্গে একটি করে জাতীয় পতাকা। রাস্তার দু'পাশে ফুটপাথে নানা দেশীয় নরনারী ও শিশু 'জয় হিন্দ' 'জয় হিন্দ' রবে সৈন্যবাহিনীদের সংবর্ধনা করলো। রাস্তার দু'পাশে প্রতি গৃহে জাতীয় পতাকা ও জাপানী 'হিনোমারু' শোভা পাচ্ছিল। শহরের রাস্তা প্রদক্ষিণ করে সকলে মাঠে উপস্থিত হলো। এক পাশে কয়েক হাজার অসামরিক লোক ও অন্য পাশে জাতীয় বাহিনী। মাঠে পেঁছানর পরই খুব বেগে বৃষ্টি শুরু হয়, কিন্তু আশ্চর্য, কেউ স্থান ত্যাগ করেনি। বৃষ্টি থামার পর বক্তৃতা শুরু হয়। প্রথমে জাতীয় বাহিনী "শুভ সুখ চৈনকী বরখা বরষে ভারত ভাগ হৈ জাগা" জাতীয় সঙ্গীতটি সমবেতভাবে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গান করেন। লীগের তরফ থেকে অনেকেই বক্তৃতা করেন। বাহিনীর তরফ থেকে এক নম্বর ডিভিসন কম্যাণ্ডার কর্নেল (পরে মেজর জেনারেল) কিয়ানী বক্তৃতা করেন। তাঁর হৃদয়স্পর্শী বক্তৃতাতে জনতা বিশেষ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ঘন ঘন 'জয় হিন্দ' 'নেতাজী জিন্দাবাদ' 'চলো দিল্লী' প্রভৃতি ধ্বনির মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

এমনি ভাবেই দিন কাটছিল। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আমাদের আজাদ হিন্দ বাহিনী বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। পাঁচ তারিখের খবরের কাগজে যখন এই খবর প্রকাশিত হয়, তখন সকলেই এত আনন্দিত হয়েছিল যে, প্রত্যেকে খবরের কাগজ হাতে চারিদিকে ছুটাছুটি করতে থাকে, আর এই নিয়ে চারদিকেই নানা আলোচনা শুরু হয়ে যায়। সকলের মুখেই একই কথা, এতদিন পরে সত্যই যুদ্ধের সুযোগ পেয়ে আমাদের বাহিনী ধন্য হলো। বহু লোক সৈন্যদলে যোগদানের জন্য আবেদন করে, কিন্তু শিক্ষার্থী সৈন্যের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, অন্যান্যকে বাধ্য হয়েই ব্যর্থমনোরথ হতে হয়েছে।

১৩ই ফেব্রুয়ারীঃ—আমরা টাইপিঙ থেকে বিদায় নিলাম। ভোর প্রায় ৬টার সময় আমরা গোপনে স্টেশনে হাজির হলাম। গাড়ি ছাড়তে বেলা প্রায় আটটা বাজলো। সব

গাড়িখানাই আমাদের জন্য স্পেশাল। এবার সকলের মনেই খুব আনন্দ, কারণ আমরা এবার চলেছি রেঙ্গুনের পথে, সেখান থেকে একেবারে যাবো 'ফ্রন্টে'। দুপুরের দিকে আমরা 'প্রাই' স্টেশনে হাজির হলাম। এখানে জাপানীরা আমাদের জন্য আগে থেকেই ভাত রেঁধে রেখেছিল। সকলে সেই ভাত ও তরকারী খেলাম। প্রাই স্টেশনের ওপারেই হচ্ছে পেনাঙ, মালয়ের একটি সুন্দর দ্বীপ। সন্ধ্যার সময় এসে পেঁছিলাম হরজাই। আগে এইটিই শ্যাম ও মালয় রাজ্যের সীমান্ত স্টেশন ছিল, কিন্তু ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে জাপানের তরফ থেকে প্রধান-মন্ত্রী তোজো কর্তৃক 'কেডা', 'কেলান্তন', 'পারলিস' ও 'ট্রানগানু' শ্যাম রাজ্যকে ফেরত দেওয়াতে সীমান্ত এখন অনেকটা দক্ষিণে। শ্যাম রাজ্যের মধ্য দিয়ে আমাদের ট্রেন ছুটে চলেছে। ঠিক আমাদের দেশের মতোই দুধারে খোলা প্রান্তর, মাঝে মাঝে দু'চারটি ছোট ছোট বাগান। প্রত্যেক স্টেশনে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে কলা আর 'ম্যানগোষ্টিন' ফল। এমনি ভাবেই আমরা এসে পেঁছিলাম ছোট একটি শহরে—নাম চামপুণ।

॥ ২ ॥

স্টেশনের কাছেই একটি ছোট ক্যাম্পে আমাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছিল। এখানে অনেক জাপানী সৈন্য ছিল। আমাদের থাকা ও খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত সব কিছু তারাই করছিল। ছেঁচা বাঁশের মাচান—লম্বা লম্বা ব্যারাক, তাতেই থাকা ও শোবার বন্দোবস্ত। শুনলাম আমাদের এখানে কয়েকদিন হয়তো থাকতে হবে। ছোট শহর, আমাদের দেশের মতোই অপরিষ্কার ধূলিভরা রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে নানা রকম জিনিসের দোকান। দোকানী বেশীর ভাগই নারী। জিনিসপত্র মালয়ের চাইতে অনেক সস্তা। কিন্তু এদেশে আসার আগে মালয়ী পয়সা বদল করার সুযোগ পাইনি, সেজন্য যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। দশ ডলারের নোট আমরা পাঁচ ডলারে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছি, কারণ এ ছাড়া কোনও জিনিস কেনার উপায় ছিল না। আগেই শুনেছি বর্মাতে সব জিনিসেরই দাম খুব বেশী, কাজেই নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিস শ্যাম থেকে যতটা নিয়ে যাওয়া যায় ততই লাভ। তাই আমরা টুথপেষ্ট, গায়ে-মাখা ও কাপড়-কাচা সাবান, ব্লেড প্রভৃতি কিছু কিছু কিনলাম।

দোকানীদের মধ্যে ইংরাজী জানা লোক খুব কম। তবে চলতি জাপানী ভাষা প্রায় সকলেই জানে। শ্যামবাসী ছাড়া ভারতীয়দেরও দু'চারখানা দোকান এখানে আছে। প্রায় প্রত্যেক দোকানেই রাজা আনন্দ মহীদল অথবা প্রধান মন্ত্রী বিপুল সংগ্রামের ফটো শোভা পাচ্ছে। ব্যাঙককের মেয়েদের রং খুব ফর্সা হলেও এখানকার মেয়েদের রং তেমন ফর্সা নয়। সৌন্দর্য হচ্ছে—এদের অনবদ্য স্বাস্থ্য, পোশাক হচ্ছে—বিলাতী কায়দার স্কার্ট। মেয়েরা মাথায় টুপী ও পায়ে জুতা পরে।

ক্যাম্পের কাছেই একটি ছোট নদী। রোজ তাতে স্নান করতাম। আমাদের দেখাদেখি বহু জাপানীও সেখানে স্নান করতে যেতো। আব্রু জিনিসটা এরা মোটেই জানে না, কাজেই, বলা বাহুল্য, মুহূর্তে নদীতে শত শত আদমের আবির্ভাব হতো। আমাদের চোখে এ দৃশ্য নিতান্ত বিসদৃশ হলেও জাপানীরা মোটেই লজ্জা পেতো না। নদীর ধারে ও আমাদের ক্যাম্পের পাশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ডাব, কলা, সিগারেট বিক্রি করতে আসতো। এখানে আমরা বেশ ভালো খাওয়া পেতাম। রোজই মাছ ও ডিম পাওয়া যেতো—আর তরকারীর মধ্যে বাঁধাকপিটাই বেশী। এখানে দু'তিনদিন ছিলাম—এবং বিকালের দিকে রোজই বাইরে বেড়াতে যেতাম।

এখানকার পুলিশের পোশাকের বেশ জাঁকজমক থাকলেও শুনেছি এদের কাজের প্রশংসা কেউ করে না। এদেশের পল্লীতে 'ওয়াট' বা মন্দির অনেক আছে। প্রত্যেক মন্দিরে হলদে রঙের পোশাক পরা গুটিকয় সাধু আছে—সেই সঙ্গে আছে কয়েকটি নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালক শিক্ষার্থী। প্রত্যেকের জীবনে একবার অন্তত কয়েক মাসের জন্যও সন্ন্যাস গ্রহণ

নাকি বাধ্যতামূলক। এমন কি শ্যামের রাজাকে পর্যন্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হয়। প্রধান মন্ত্রী বিপুল সংগ্রাম প্রথম যখন ইউরোপ ভ্রমণে জান, তখন ওদেশে অর্ধনগ্ন শ্যাম বালিকাদের ফটো বিক্রী হতে দেখেন—তারপর দেশে ফেরার পর আইন জারী করেন যে, প্রত্যেক নারী যখন পথে বার হবে, তার মাথায় থাকবে টুপী, আর পায়ে থাকবে জুতা। এমন কি পান খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করেন। অবশ্য এ সমস্ত আইন বড় বড় শহরেই সীমাবদ্ধ। শ্যামের সীমান্ত পল্লীগুলির মধ্যে নগ্নতা ও পানের বরজ যথেষ্ট লক্ষ্য করেছি। শ্যামবাসীরা বৌদ্ধধর্মী হলেও জাপানীদের মতোই এরা সর্বভুক্; অর্থাৎ মাছ ও নানাবিধ পশুপক্ষীর মাংস খেতে এরা দ্বিধা করে না। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে অনেকে নিজের হাতে হত্যা না করলেও অপরের তৈরী মাংস খেতে আপত্তি করে না।

মাত্র তিনদিন চামপুণে ছিলাম। তারপর শুরু হলো হাঁটাপথে অগ্রগমন। ভোরবেলা উঠে তৈরী হলাম। পিঠের উপর 'পিঠু'র মধ্যে মশারি থেকে আরম্ভ করে চটীজোড়া পর্যন্ত স্থান পেয়েছে, তার ওজন সবসুদ্ধ কম হলেও পঞ্চাশ পাউন্ড। ডাক্তার মানুষ, পথে-ঘাটে বিপদ হতে পারে—কাজেই অত্যন্ত আবশ্যক কয়েকটি ঔষধের একটি ঝোলা। তারপর বোঝার উপর শাকের আঁটী হিসাবে দেড় পাউন্ডের এক পিস্তল ও ছত্রিশ রাউন্ড গুলী। হাঁটাপথে জীবনে তো এই প্রথম যাত্রা—তার উপর এই বোঝা। পথ চলতে চলতে মনে পড়লো বাঙালী পল্টনের সেই গান—

"—পায়ে আছে বুটজুতা দশ সের ভারী
তদুপরি রাইফেল চলিতে কি পারি!—"

চলতে না পারলেও চলতে যখন হবেই, তখন অভিযোগ করা বৃথা—তার উপর শুনেছি—শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়। কাজেই ভগবানের নাম নিয়ে পা বাড়ালাম। যাক. প্রাণে যথেষ্ট উদ্দীপনা—আর প্রথম দিনের পথ ছিল মাত্র এগার 'কিলো', তার উপর ভগবান সহায়—আকাশ একটু মেঘলা ছিল—তাই কষ্ট খুব বেশী হয়নি। পথে জাপানীদের একটি ক্যাম্পে সারা দিনরাত কাটানো হলো। পরদিন সকালে উঠে আবার তেমনি যাত্রা শুরু। এবার যেখানে বিশ্রাম নিলাম, এটি হচ্ছে পথের ধারে একটি কুলী-ক্যাম্প। চামপুণ থেকে কাপাসী পর্যন্ত বিরানব্বই কিলোমিটার পথে নূতন রেল লাইন বসানো হচ্ছে; তারই জন্য পথের ধারে মাঝে মাঝে কুলীদের ক্যাম্প।

এই কুলী-ক্যাম্পগুলি এক একটি জীবন্ত নরক ছাড়া আর কিছু নয়। তালপাতার ছাউনি দেওয়া সামান্য ঘর, খোঁয়ারের পশুদের মতোই, তার মধ্যে নরনারী ও শিশুগুলি বসবাস করছে। চারদিকে অপরিষ্কার আবর্জনা—ভীষণ দুর্গন্ধ—অথচ সেইখানেই তাদের রান্না খাওয়া ও বসবাস। কুলী বেশীর ভাগই মাদ্রাজী তামিল। শুনেছি, প্রতিদিনই সেখানে বহু লোক মারা যাচ্ছে—অনেকে ঘরের মাঝে জ্বরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। নরকের দৃশ্যটি পরিপূর্ণরূপে বাস্তব করবার জন্যই বোধ হয় শ্যামবাসী ব্যবসায়ী তার পাশেই খুলেছে দেশী মদের দোকান—আর আনুষঙ্গিক উপকরণ কয়েকটি বিগতযৌবনা জরাজীর্ণ নারী। পরিধানে শতজীর্ণ মলিন দুর্গন্ধময় বস্ত্র, তৈল অভাবে রুক্ষ মাথার চুল—অসুখে ভুগে ভুগে অস্থিচর্মসার, ক্ষীণ দুর্বল দেহ, তারাও যখন দিনের শেষে মদ খেয়ে মাতলামো করে—তখন এদের মানুষ বলে চেনা যায় না। জীবনে সুখ, আনন্দ, স্বাস্থ্য বলে যে কোনও জিনিস আছে, তা এরা ভুলেছে। তারপর প্রেতাত্মার মতো অন্ধকারে এরা ঝগড়া করে, হিংসা করে, সামান্য কারণে রক্তারক্তি কান্ড বাধিয়ে বসে। এখানে আইনের মাপকাঠি নেই, পুলিশের বালাই নেই, সভ্যতার পর্দা নেই, নাগরিক জীবনের কোনও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নেই। আছে শুধু অভাবের তাড়না, আর অসহায় মানুষ নামধারী জীবগুলির বেঁচে থাকার জন্য কাতর অথচ ক্ষীণ প্রচেষ্টা। এদের এই অবস্থা দেখে মনে পড়ে গেল সেইসব ধনীর কথা—যারা এদের এমনি করে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিয়ে—প্রাসাদোপম অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ সুখশয্যায় বিজলী পাখার নীচে আরাম উপভোগ করছে। সেই প্রকৃত স্বর্গ জীবনে দেখেছি, আর আজ চোখের সামনে দেখলাম প্রকৃত নরক। এদেরও নাম মানুষ, আর আজও এরা জগতের বুকে বেঁচে আছে।

দ্বিতীয় দিন মার্চ করলাম প্রায় তেইশ কিলোমিটার। ভোরবেলা উঠে ভাত তরকারী সঙ্গে নিয়ে শুরু করলাম আবার 'কদম কদম বাড়ায়ে যা'। দুপুরবেলা আগের দিনের মতোই একটি কুলী-ক্যাম্পের কাছাকাছি বাগানে বিশ্রাম করা গেল। খাওয়া সারার পর গাছতলায় শুয়ে বেশ একটি আরামদায়ক নিদ্রা। দীর্ঘ পথ চলার ক্লান্তি—বিশেষ করে পিঠের উপর 'পিঠু'টার ভার শরীরকে একেবারে অবশ করে দেয়। অল্প একটু চলার পর মনে হয় হাত দুটো একেবারে অবশ হয়ে গেছে—কাঁধে ব্যথা শুরু হয়। অথচ জিনিস যা আছে, সবই দরকারী; ফেলে দেবার মতো অনাবশ্যক বা সৌখনতার কোন জিনিস নেই। বিকালে কাছাকাছি জলের সন্ধান করে বেশ ভালভাবে স্নান করার পর শরীরের সমস্ত অবসাদ দূর হয়ে গেল। অনেকের পায়ে অল্পবিস্তর ফোস্কা পড়েছিল—তাদের গরম নুন-জল দিয়ে পা ধোবার বন্দোবস্ত করে দিলাম। আর যারা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাদের জন্য লরীর বন্দোবস্ত করা হলো। রাতে বেশ আরামে ঘুম দেওয়া গেল। পরদিন আবার ছাব্বিশ কিলোমিটার পথ চলতে হবে।

সকালবেলা উঠেই চলা শুরু হলো। বলা বাহুল্য, যাত্রার আগে একটু দুগ্ধবিহীন চা তৈরী করে পান করা হয়েছিল। বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ এসে পেঁছিলাম কারাবুরি। আমরা এখন যে পথ অতিক্রম করে চলেছি, সেটি ক্রা যোজক। এইটিই হচ্ছে সবচেয়ে কম চওড়া জায়গা। কোনদিন এখানে খাল কেটে বঙ্গোপসাগর ও শ্যাম উপসাগরকে এক করে দেওয়া বিচিত্র নয়। সম্প্রতি বৃটিশের সঙ্গে শ্যামরাজ্যের যে সন্ধি হয়েছে, তার সর্তগুলির মধ্যে বৃটিশের একটি সর্ত এই যে, বৃটিশের বিনা অনুমতিতে শ্যাম এখানে কোনদিন খাল কাটতে পারবে না।

এখানে থাকার জায়গা আগের তুলনায় অনেক ভালো। ছোট জায়গা হলেও দু'চারখানা দোকান-পসার এখানে আছে। বেশ গরম পড়েছে, তায় এই দীর্ঘ পথ; কাজেই আজ একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম; কিন্তু ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন তাই ক্যাম্পে পেঁছানর পরই দেখা হলো সিঙ্গাপুরের পরিচিত সুধাংশু চক্রবর্তীর সঙ্গে। চামপুণ থেকে কাপাসী পর্যন্ত রেল-লাইনের কনট্রাক্ট নিয়েছে সিঙ্গাপুরের বোস কোম্পানী। তাদেরই একটি ছোট অফিস এখানে। তার বাড়িতে গেলাম। ডাবের জলে তৃষ্ণা নিবারণ করে মৃতদেহে যেন প্রাণ সঞ্চার হলো। রাতে সুধাংশুর কাছে পরোটা ও নিষিদ্ধ পক্ষীর মাংস দিয়ে উদর পরিপূর্ণ করে বিদায় নিলাম। তারপর ক্যাম্পে শয়ন ও সুনিদ্রা।

রাতের অন্ধকার থাকতে থাকতেই ভোর প্রায় চারটের সময় কদম বাড়ালাম। আজকের পথ হচ্ছে সব চাইতে বেশী—প্রায় বত্রিশ কিলোমিটার। অল্পক্ষণ চলার পরই আজ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। পথ যেন আর শেষ হতেই চায় না। যেখানে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম হয় সেখান থেকে আর মোটেই উঠতে ইচ্ছা করে না। তার উপর রোদের তেজ ক্রমশ তীব্র হতে শুরু করলো। বেলা প্রায় বারোটার সময় একটি ছোট বাগানে বিশ্রাম করে ভোজনপর্ব সমাধা করলাম। তারপর সেখানেই গাছতলাতে পড়ে রইলাম বেলা তিনটে নাগাদ। তারপর আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম; কারণ, আগে যে বাড়তেই হবে। পিঠের বোঝাটা হঠাৎ যেন অসম্ভব রকম ভারী হয়ে উঠেছে। পা দু'টা আর যেন মনের আদেশ মানতে চায় না। প্রতি পদেই বিশ্রাম করতে ইচ্ছা হয় অথচ বিশ্রাম করলেও আর উঠতে ইচ্ছা করে না। যাই হোক, এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর এসে পেঁছিলাম আমাদের গন্তব্যস্থল কাপাসী। আমরা আসছি এ খবর আগেই পেঁচেছিল; কাজেই আমাদের বন্দোবস্ত সব ঠিক ছিল। চায়ের জলও গরম হচ্ছিল। ছেঁচা বাঁশের মাচানের উপর একেবারে বুট-পট্টিসমেত গা এগিয়ে দিলাম। সন্ধ্যার সময় শুনলাম, এখানে তিন-চার দিন থাকতে হবে। কতকটা আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম গায়ের ব্যথা ও পায়ের ফোস্কা কতকটা কমিয়ে নেওয়া যাবে এবার। তিন দিনের আরামে সব ক্লান্তি দূর হবে। এখানে জলের খুব অসুবিধা। দু'টি কুয়াতে যা জল আছে, তা রান্না ও খাওয়ার পক্ষেই যথেষ্ট নয়, কাজেই স্নানের জল পাওয়া অসম্ভব। কাছেই অবশ্য সমুদ্র। এদিককার রেললাইন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; আশা করা যায়, আমাদের পরে যারা আসবে এই পথটা তাদের আর হেঁটে কষ্ট ভোগ করতে হবে না। এখানে

তিনদিন বিশ্রামের পর সত্যই শরীরের ক্লান্তি অনেক কমে গেল। আবার আমরা নূতন উৎসাহের সঙ্গে বর্মার দিকে এগিয়ে চললাম।

প্রায় নয়শত টনের ছোট্ট একটি জাহাজ, আগে নাম ছিল এস. এস. ভায়লেট। বর্তমানে জাপানী নাম হচ্ছে সুজিমারু। জাহাজে জায়গা খুব বেশী না হলেও বসবার মতো জায়গা ছিল। আগেই হুকুম হয়েছিল জাহাজে রান্নাবাড়া কিছু হবে না, তাই রুটি তৈরী করে নেওয়া হয়েছিল। আমরা নিতান্ত অখাদ্য নয় এমনি কিছু বিস্কুট কিনে নিয়েছিলাম। জাহাজে ধূম পান একেবারেই নিষিদ্ধ; একান্ত গোপনীয়ভাবে ও কাজটি পায়খানাতে সারতে হলো। অবশ্য খানিক পরেই অন্যান্য অফিসাররা ঘন ঘন আমার পায়খানা যাওয়ার কারণ বুঝতে পারলেন। কাজেই বলা বাহুল্য, পায়খানাই শেষকালে আমাদের ধূমপান গৃহরূপে ব্যবহৃত হতে লাগলো। তীর ঘেঁষে আমাদের ছোট জাহাজ হেলেদুলে চলেছে। চারপাশে মারগুই দ্বীপপুঞ্জের অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ তাদের শ্যামল মাথা উঁচু করে সগর্বে সমুদ্রের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষাশেষি হলেও তখন বেশ গরম পড়েছে। আমাদের সঙ্গে কেটলীতে যে জল ছিল তা শেষ হয়ে গেল। একে তো সঙ্গের খাবার শুকনো রুটি ও বিস্কুট, তার উপর জলের অভাব; কাজেই অবস্থা যে বিশেষ সুবিধার নয় তা বেশ অনুভব করা যায়। অনেকে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে খালাসীদের কাছ থেকে এক টাকায় এক মগ করে জল কিনতে পর্যন্ত বাধ্য হয়েছে। যাই হোক, সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই যখন, সহ্যই করতে হলো। পরের দিন দূর থেকেই দেখতে পেলাম, বর্মার বিখ্যাত প্যাগোডাগুলির স্বর্ণচূড়া সূর্যের আলোকে ঝলমল করে উঠেছে। বেলা প্রায় দশটায় আমরা বর্মার একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত মারগুই দ্বীপে এসে পেঁছিলাম।

॥ ৩ ॥

কাছেই ক্যাম্প। হাজির হলাম সেখানে। অল্পক্ষণ পরে একটি বাঙালী ভদ্রলোক এসে হাজির হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনিই ডাক্তার বসু?' আশ্চর্য হলাম। এখানে আমার পরিচিত কেউ নেই। আমার উত্তর শুনে বললেন, 'সব কথা পরে হবে। আমি মজুমদার। আমার ওখানেই খাওয়াদাওয়া করবেন। চলুন আমার সঙ্গে।' বলা যত সহজ কাজে তত সহজ নয়। ক্যাম্প ছেড়ে বাইরে যাওয়ার জন্য অনুমতি দরকার। তা ছাড়া সব সময়ে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করাও ঠিক নয়। খানিক পরে কর্নেল সাহেবের অনুমতি নিয়ে বার হলাম। ছোট শহর, রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য ছোট ছোট দোকান। রাস্তা ধূলিভরা, চারদিক অপরিষ্কার। অনেকগুলি ছোট বড় নানা রকমের প্যাগোডা আছে। বুদ্ধদেবের বহু মূর্তি। কোন কোন মূর্তি উচ্চে বিশ পঁচিশ ফুট পর্যন্ত হবে। কতকগুলির রং সোনালী—বেশীর ভাগই সাদা। এই রকম অনেকগুলি বুদ্ধমূর্তি ও মন্দির দেখলাম। আগে শুনেছি প্যাগোডার দেশ এই বর্মা, এখন দেখছি সে কথা মোটেই মিথ্যা নয়। ভদ্রলোক বাড়িতে একাই থাকেন, কাজেই খাওয়ার নিমন্ত্রণটা সারতে হলো একটি হিন্দুস্থানী হোটেলে। অনেক রকম গল্প হলো তাঁর সঙ্গে। শুনলাম ভারতীয়দের অনেকের অবস্থা খুব শোচনীয়। আমার আগে গান্ধী রেজিমেণ্টের ডাঃ বীরেন রায় এই পথ দিয়ে রেঙ্গুন গিয়েছেন,—তাঁর কাছেই শুনেছেন যে, আমি শীঘ্রই এই পথে আসবো। এখানকার বাঙালী ও অবাঙালী ভারতীয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। সকলেই আমরা আগে যাচ্ছি বলে খুব আনন্দিত। একটি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হলো। ভদ্রলোক ডাক্তার। বর্মী ডাকাতে তাঁর সর্বস্ব লুট করে নিয়েছে। গৃহে স্ত্রী ও এক অবিবাহিতা কন্যা। পরিধানে শত গ্রন্থিময় দু'টি মাত্র শাড়ী। আর কোনও কাপড় নেই। অবস্থা দেখে দুঃখিত হওয়া যায়, কিন্তু সাহায্যের কোন উপায় নেই। টাকা থাকলেও কাপড় মোটেই পাওয়া যায় না। কাপড় চোরাবাজারে কোথাও পাওয়া গেলেও তার দাম পড়ে দেড়শো দু'শো টাকা। মালয়ে সব জিনিসের অভাব থাকলেও সেখানকার অবস্থা বর্মার মতো এতটা শোচনীয়

নয়। সারাটা দুপুর ভদ্রলোকের সঙ্গে ছোট্ট মারগুই শহরটা ঘুরে বেড়ালাম। শুনলাম যুদ্ধ এদিকে কিছুই হয়নি। বর্তমানে মাঝে মাঝে বৃটিশের আকাশ-যান দেখা গেলেও এ পর্যন্ত এখানে কোন প্রকার ক্ষতি হয়নি। এখানে মাত্র দু'দিন ছিলাম।

পরদিন বিকালে এখানকার 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগে'র তরফ থেকে আমাদের অফিসারদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল চা পানের জন্য। কয়েকজন জাপানী অফিসারও উপস্থিত ছিলেন; তাঁদের মধ্যে একজন নৌবিভাগের খুব উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। ডালমুট, চা ও কিছু মিষ্টি—সঙ্গে সঙ্গে কিছু বক্তৃতাও হয়েছিল। স্থানীয় লীগের সভাপতি মিঃ পাল আমাদের অভিনন্দিত করেন। একজন জাপানী অফিসার যুদ্ধ কোথায় হচ্ছে এবং জাপানীরা কিভাবে লড়ছে, ভারতীয় জাতীয় বাহিনী কোথায় কিভাবে লড়ছে, সব কিছু খবর জানালেন। আমাদের তরফ থেকে একজন অফিসার লীগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সন্ধ্যার অল্পক্ষণ আগেই আমাদের সভা ভঙ্গ হয়।

কয়েকখানা বড় বড় নৌকা তৈরী ছিল—তৃতীয় দিন সকাল বেলা আমরা তাতেই উঠে বসলাম। সকাল প্রায় ন'টায় নৌকাগুলি চলতে লাগল। বেলা প্রায় বারটায় পেঁছিলাম টামক (Tamok)। কাছাকাছি একটি বাগানে আশ্রয় নিয়ে সেখানেই সঙ্গে করে আনা ভাত তরকারী খাওয়া শেষ করলাম। এখান থেকেই আমাদের খুব সাবধানতার সঙ্গে এগুতে হবে, কারণ মাঝে মাঝে বৃটিশের এরোপ্লেন এদিকে ঘোরাঘুরি করে। তবে এ পর্যন্ত কোথাও কোন ক্ষতি হয়নি। দুপুরবেলা কয়েকখানা জাপানী লরী এসে হাজির হলো, আমরা তাতেই উঠে বসলাম। এক একটি লরীতে প্রায় পঞ্চাশজন, অর্থাৎ যতটা বেশী সম্ভবপর ততটাই। বিকেলের দিকে টামক থেকে প্রায় ৪২ মাইল দূরে পালোউ এসে পেঁছিলাম। এখানে জাপানীদের একটি ক্যাম্প আছে। কাছাকাছি গ্রাম দেখলাম না। বেশ পরিষ্কার জায়গা। বিমান আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য ক্যাম্পে অনেক ট্রেঞ্চ কাটা আছে। এখানে সারা রাত কাটানো হলো।

কোথাও বা লরীতে কোথাও বা হাঁটা-পথে—এইভাবে চারদিন পরে এসে পেঁছিলাম টেভয়। টেভয়ে পেঁছানর সময় বেশ একটি মজার ঘটনা ঘটে। আমাদের লরীর জাপানী ড্রাইভার আগে থেকেই বলেছিল এরোপ্লেনের উপর নজর রাখতে। শহরের প্রায় ভিতরে ঢুকে পড়েছি এমন সময় একটি জাহাজ দেখা গেল অনেক দূরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলেই চীৎকার করে উঠলো 'হিকোকী' 'হিকোকী', অর্থাৎ উড়ো জাহাজ। ড্রাইভার বেচারী হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে কোথায় গাড়ি থামাবে ঠিক করতে না পেরে গাড়ি সমেত একেবারে গিয়ে পড়লো রাস্তার ধারে নালার উপর। কয়েকজন ছিটকে এদিকে ওদিকে পড়ে গেল, তবে ভাগ্যক্রমে কেউ আহত হয়নি। পরে দেখা গেল জাহাজটি জাপানীদেরই। লরীতে দুই টিন তেল ছিল, গাড়ির অনেকেই বিশেষভাবে তৈলসিক্ত হয়ে পড়লো। বিপদের ভয় কেটে যাওয়াতে সকলেই আবার হাসতে হাসতে লরীতে উঠে বসলো (অবশ্য 'তৈলসিক্তে'রা এ হাসিতে যোগ দিতে পারেনি)। ক্যাম্পে এই গল্প করার পর সকলেই বেশ আমোদ উপভোগ করলো। এখানে থাকা-খাওয়ার বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল। আমাদের 'অগ্রগামী দল' সব কিছু বন্দোবস্ত করে রেখেছিল। আমাদের দলের কয়েকজন বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, তাদের সঙ্গে করে প্রথমেই স্থানীয় জাপানী হাসপাতালে হাজির হলাম। কয়েকজনকে ভর্তি করতে হলো। জাপানী হাসপাতালে সেবাযত্নের ত্রুটি না হলেও আমাদের লোকেরা দুটি কারণে সেখানে ভর্তি হতে চাইতো না। একটি হচ্ছে ভাষা না জানার অসুবিধা, আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে জাপানীদের খাদ্যাখাদ্য বিচার না থাকা।

সন্ধ্যার আগে শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। খুব পুরাতন শহর, আর চারিদিকেই শুধু ধ্বংসের স্তূপ। পিছু হঠার সময় বৃটিশরা যতদূর সম্ভব শহরটির সর্বনাশ সাধন করেছে, যার নাম হচ্ছে 'পোড়া মাটি নীতি'। শহর বড় হলেও একেবারে ধূলিভরা অপরিষ্কার। লীগের একজন অফিসার সন্ধ্যায় আমাদের কয়েকজনকে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। পথে কয়েকদিন খাওয়ার কষ্ট ভোগ করার পর পরোটা ও মাংস যে খুবই উপাদেয় লেগেছিল, সেকথা বলা বাহুল্য মাত্র। রেঙ্গুন লীগ হেড-কোয়ার্টার থেকে পথে যাতে আজাদ হিন্দ

বাহিনীর কষ্টের লাঘব হতে পারে, তার বন্দোবস্তের জন্য একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রত্যেক লীগ অফিসে ভ্রমণ করে সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্তের চেষ্টা করেছেন। আমাদের আগে এই পথ দিয়ে প্রথমে সুভাষ ও পরে গান্ধী রেজিমেণ্ট রেঙ্গুন গিয়েছে। পথে তাদের নানাপ্রকার কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। সেই কারণেই প্রত্যেক লীগ অফিসের উপর হুকুম জারী হয়েছে, তারা যেন সর্বপ্রকারে আমাদের সাহায্য করে। কাজেই আগের রেজিমেণ্টের মতো আমাদের পথে খুব বেশী অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। এখানেও মাত্র দু'তিন ঘর বাঙালী সপরিবারে বসবাস করছেন। তাঁদের সঙ্গেও বেশ আলাপ পরিচয় হলো। আমরা খুব শীঘ্রই দেশে ফিরতে পারবো সকলেই সেই আশা করেছে, কাজেই প্রত্যেকের বাড়ির ঠিকানাতে আমাদের ডায়েরীর প্রায় সব পাতাই ভর্তি হয়ে গেল। আমরা কোন্ ফ্রণ্টে যাবো তা জানা ছিল না। তখন আরাকান ও ইম্ফল দু'দিকেই জোর লড়াই হচ্ছে। কাজেই চট্টগ্রাম ও আসামের দিকের বহুলোক তাঁদের বাড়ির ঠিকানা আমাদের দিয়েছিলেন। টেভয়ে মাত্র দু'দিন ছিলাম। এখান থেকে এবার যেতে হবে একেবারে 'ইয়ে', সেখান থেকেই বর্মা-দেশের রেল লাইন শুরু হয়েছে। পথে দু'দিন কোন লরী পাওয়া যায়নি। সেজন্য ত্রিশ মাইলেরও বেশী পথ 'কদম কদম বাড়ায়ে যা' করেই শেষ করতে হলো। অবশেষে ইয়ে এসে পেঁছিলাম। টামক থেকে ইয়ে পর্যন্ত প্রায় দু'শো পঞ্চাশ মাইল পথ পার হতে আমাদের প্রায় দশদিন সময় লাগলো। এবার রেল লাইন—কাজেই হাঁটার হাত থেকে বাঁচা যাবে কিছুদিন।

ইয়ে'তে দু'দিন মাত্র ছিলাম। এখান থেকে রেল লাইন শুরু হয়েছে। গাড়ি শুধু রাতেই চলে; দিনে উড়োজাহাজের যাতায়াতটা খুব বেশী। কয়লার অভাব, তাই রেল চলেছে কাঠের আগুনে! গাড়িতে ভিড় খুব বেশী—মিলিটারী ছাড়াও সিভিলিয়ান অনেকে যাতায়াত করছে। বেশীর ভাগই হচ্ছে মালগাড়ির 'ডাব্বা'। তাতেই পঁচিশ থেকে ত্রিশজন করে লোক যাচ্ছে। তার উপর মিতব্যয়িতা, যা জাপানীর কাছে শিক্ষণীয়। ডাব্বার উপর বস্তা বস্তা চাল বা অন্যান্য জিনিস, তার উপর মানুষ। এমন কি জায়গার অভাবে বহুলোক গাড়ির ছাদের উপরেও আশ্রয় নিয়েছে।

ইয়ে থেকে মৌলমেন পর্যন্ত আমরা নিরাপদে এসে পেঁছিলাম। মৌলমেন শহরের উপর প্রায়ই বিমান আক্রমণ হচ্ছে। তাই শহর থেকে প্রায় আট মাইল দূরে একটি রবার জঙ্গলে আমরা আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। মৌলমেন বর্মার একটি বিখ্যাত শহর হলেও বর্তমানে এখানে কিছুই নেই। শহরের অধিকাংশ অধিবাসী দূরে দূরে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। দিনের বেলা বিরাট শহরটি যেন রূপকথার গল্পের মতোই ঘুমন্ত। বড় বড় বাড়ি খালি পড়ে রয়েছে। অনেক বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এখানে আমার কয়েকজন রুগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার বিশেষ দরকার হয়ে পড়ে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জাপানী হাসপাতালের সন্ধান পাওয়া গেল। কয়েকজনকে ভর্তি করলাম—অন্যান্যদের জন্য কিছু আবশ্যকীয় ঔষধ সংগ্রহ করলাম।

মাত্র চারদিন পর আমরা তৈরী হলাম মৌলমেন থেকে নদী পার হয়ে মারথাবান যাবার জন্য। সকাল ন'টায় ডকে এসে হাজির হলাম। তখন কিছু জাপানী সৈন্য নদী পার হচ্ছিল, কাজেই আমাদের অপেক্ষা করতে হলো। বেলা প্রায় এগারোটা। একটি ছোট জাহাজ বোঝাই করে জাপানীরা নদী পার হচ্ছে এমন সময় বেজে উঠলো বিপদ-সঙ্কেত। প্রায় চারখানা বৃটিশ বিমান এসে পড়লো নদীর উপর। আমাদের কাছাকাছি নিরাপদ আশ্রয় কিছু ছিল না। আমরা মাটির উপর চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। কয়েকটা বোমা পড়ার শব্দ হলো: মেসিনগানেরও কিছু আওয়াজ শুনলাম। খানিক পরে বিমানগুলি চলে গেল। আমাদের আশপাশে কোনও ক্ষতি হয়নি। যে জাহাজখানা জাপানীদের নিয়ে যাচ্ছিল, তাতে আগুন লেগে গেল। কয়েকটি নৌকা ও জাহাজ পাঠানো হয়েছিল সাহায্যের জন্য। তারা ফিরে এলে দেখা গেল কয়েকজন জাপানী মারা গেছে ও কয়েকজন আহত হয়েছে। বহুদিন পরে এই প্রথম বিমানাক্রমণ; কাজেই আমাদের প্রাণে খুব ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল। প্লেনগুলি চলে যাওয়ার পর আহত জাপানীদের হাসপাতালে পাঠানো হলো। তারপর প্রায় দু'তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আমরা নদী পার হয়ে মারথাবান পেঁছিলাম। মেসিনগানের গুলী

এখানে খুবই লেগেছে। স্টেশন থেকে মাইল খানেক দূরে ছোট একটি গ্রামের পাশে, বাগানে আমরা দিনের মতো আশ্রয় নিলাম। বেলা প্রায় ছ'টার সময় ট্রেনে উঠে বসলাম। এদিকেও ট্রেনে খুব ভীড়। বহু সিভিলিয়ান বর্মী ছাদের উপর আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। সারা রাত ও পরদিন বেলা প্রায় দশটা পর্যন্ত ট্রেন চললো। তারপর আমরা গাড়ি থেকে নেমে কাছাকাছি একটি গ্রামে আশ্রয় নিলাম। বেশ গরম পড়েছে; সারা গ্রামে মাত্র দুটি কুয়ো। গ্রামবাসী ছাড়াও আমরা প্রায় ছ'শো লোক। কাজেই স্নানের বিলাস ত্যাগ করতে হলো। এখানেই রান্না করে খাওয়া হলো—তারপর গাছতলায় বিশ্রাম। বেলা প্রায় পাঁচটায় আবার ট্রেনে উঠলাম। পথে সিটং নদীর বড় পুলটি বিমানাক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য এখানে আমাদের বিমানধ্বংসী একটি কোম্পানী আছে। তাদের ভয়ে এদিকে বৃটিশের বিমানগুলি চেষ্টা করেও ঠিক নিশানাতে বোমা ফেলতে পারতো না। আমাদের এই কোম্পানীটি বৃটিশের বহু বিমান ধ্বংস করেছে। সিটং নদীর উপরের পুলে বৃটিশ বোমা ফেলাতে কিছু ক্ষতি হয়েছিল কিন্তু জাপানীরা ইতিমধ্যেই তার মেরামতের কাজটা সেরে নিয়েছিল। কাজেই আমাদের ট্রেন ভাঙা পুলের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে নদী পার হলো। এখানে জাপানী ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশংসা না করে উপায় নেই। বৃটিশরা একটা পুল তৈরী করার পর সেখানে গুটিকতক নোটিশ লাগিয়ে রাখে; যেমন—"কোন গাড়ির গতি যেন পাঁচ মাইলের বেশী না হয়", "দুই টনের লরীর যাতায়াত নিষেধ" প্রভৃতি। জাপানীরা বাঁশ, কাঠ, তক্তা দিয়ে পুল সারায়, তার উপর দিয়ে সব রকম গাড়ি অনায়াসে যাতায়াত করে; নোটিশের কোনও বালাই নেই। এতবড় 'সিটং' পুলের একটি 'স্প্যান' প্রায় উড়ে গেছে, তার উপর কাঠের খুঁটি ও তক্তা লাগানো হয়েছে অথচ আমাদের বিরাট ট্রেন অনায়াসে তার উপর দিয়ে পার হলে গেল। সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় আমরা পেগু পেঁছিলাম। এখানকার স্টেশনের দৃশ্য দেখেই বোঝা গেল বর্মার উপর বৃটিশ বিমানের আক্রমণের প্রচণ্ডতা কী ভীষণ! স্টেশন ও তার আশপাশের সমস্ত পাকাবাড়ি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। প্ল্যাটফরমের উপরে অনেক বড় বড় গর্ত। তা সত্ত্বেও ট্রেন ঠিক নিয়মিতভাবেই যাতায়াত করছে। এখানে জাপানীরা আগে থেকেই আমাদের জন্য ভাত তরকারী রেঁধে রেখেছিল—আমরা তাই খেলাম। রাত প্রায় এগারটার সময় রেঙ্গুনের আগে একটি ছোট স্টেশনে নামলাম। সেখানে আমাদের 'গাইড' এসেছিল। নামার পর কাছাকাছি 'গোসালা ক্যাম্পে' রাতের মতো আশ্রয় নিলাম। এই ক্যাম্পে সিভিলিয়ানদের ট্রেনিং দেওয়া হয়। ভোরবেলা আবার নিজেদের ক্যাম্পে যাবার জন্য তৈরী হলাম। কিন্তু কপালে খানিকটা কষ্টভোগ ছিল, কাজেই আমাদের 'গাইড' খানিকদূর যাওয়ার পর খবর এল আমরা ভুল পথে যাচ্ছি, আমাদের যেতে হবে 'কুর্সিং স্কুল ক্যাম্পে'। আবার উল্টো দিকে চলতে শুরু করলাম। পথে খানিকদূর যাওয়ার পর সাইরেন বেজে উঠলো। কাছাকাছি একটি বাগানে আশ্রয় নিলাম। কোথাও কিছু হয়নি। আবার চলতে শুরু করলাম। বেলা প্রায় দুটোর সময় 'কুর্সিং' স্কুলে পেঁছিলাম। প্রায় চৌদ্দ মাইল পথ চলেছি। ক্লান্তিও এসেছে যথেষ্ট। ক্যাম্পে পেঁছে বিশ্রাম করা গেল।

কুর্সিং স্কুল ক্যাম্প রেঙ্গুনে। শহরের মাঝেই এই স্কুল। খুব বড় বাড়ি। বাজার এখান থেকে খুবই কাছে। বিমানাক্রমণের ভয় থাকা সত্ত্বেও সকালে বেশ বড় বাজার বসে। কাছেই রেঙ্গুন সেন্ট্রাল জেল। মাঝে মাঝে দেখতাম জাপানীরা এখানকার জেলে বন্দী বহু বৃটিশ সৈন্যকে কাজের জন্য বাইরে নিয়ে যেতো। এইসব বন্দীরা গরমের জন্য খালি গায়ে শুধু হাফ প্যান্ট পরেই কাজ করতো। আমরা মাত্র কয়েকদিন এখানে ছিলাম। তারপর চলে যাই মিংলাডন ক্যাম্পে। একেবারে বিমান ঘাঁটির কাছাকাছি। আমার পুরো রেজিমেন্ট এখানে এসে জমা হয়েছে। তা ছাড়া আজাদ হিন্দ বাহিনীর আরো কিছু সৈন্য এখানে ছিল। খুব ফাঁকা জায়গা। এখানে আমাদের জন্য প্রচুর দুধের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক রেজিমেন্টে যারা ফ্রন্টে যেতো তারা সকলেই প্রায় দু'তিন সপ্তাহ রেঙ্গুনে থাকতো। এখানে আসার পর দিনের বেলা বিমান আক্রমণ মোটেই দেখিনি, যদিও মাঝে মাঝে সাইরেন বেজে উঠতো। শুনেছি ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে একদিন দুপুর বেলা বৃটিশের প্রায়

পঞ্চাশখানা বিমান আক্রমণ করে কিন্তু জাপানীদের বিমানধ্বংসী কামান ও জঙ্গী বিমান প্রায় সাতাশখানা বৃটিশ বিমানকে ভূপাতিত করে। তারপর থেকে দিনের বেলা বৃটিশ বিমান বড় একটা দেখা যেতো না। রাতে প্রায়ই আক্রমণ হতো। বিশেষ করে আমরা বিমান-ঘাঁটির একেবারে কাছাকাছি বলে রাতে প্রায় প্রত্যহই তিন চারবার বিছানা ছেড়ে ট্রেঞ্চে আশ্রয় নিতে বাধ্য হতাম। তখন ইম্ফলের কাছাকাছি খুব জোর লড়াই চলছে। আমরা যে ইম্ফল ফ্রন্টে যাবো সে খবরটুকু গোপনে সংগ্রহ করেছিলাম। রেঙ্গুনে খাদ্যসামগ্রীর দাম খুব বেশী। গাড়ি-ঘোড়ার অভাবে বাইরে বেশী বেরুনো অসম্ভব ছিল, কারণ আমাদের ক্যাম্প থেকে শহর অনেকটা দূরে। তবু মাঝে মাঝে লুইস স্ট্রীটে বাঙালীর দোকানে রসগোল্লা ও সন্দেশ খাবার লোভে হাজির হতাম। এতবড় বাঙালীপাড়া এখন একেবারেই খালি। দূরে দূরে দু'চার ঘর মাত্র লোক আছে। অন্যান্যরা প্রায় সকলেই শহরের বাইরে আশ্রয় নিয়েছে। রেঙ্গুনে 'মিয়াং'-এ আমাদের একটি বড় হাসপাতাল ছিল। এটি আমাদের এক নম্বর হাসপাতাল নামে পরিচিত ছিল। এখানকার হাসপাতালের কম্যান্ডার ছিলেন মেজর গোস্বামী। মাঝে মাঝে বিকালের দিকে আমরা বেড়াতে যেতাম। ডাক্তার কম থাকাতে রেজিমেন্টের কয়েকজন ডাক্তার হাসপাতালের কাজ করতেন। আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছাই, তখন 'গান্ধি রেজিমেন্ট' পুরোপুরি ফ্রন্টে যায়নি। তাদের দু'জন ডাক্তার কানাই দাস ও ডাঃ চান্কে তখনও ক্যাম্পে ছিলেন। আমরা আসার কয়েকদিন পরে তাঁরা ফ্রন্টে যান।

শুনলাম নেতাজী বিশেষ কাজে শীঘ্রই রেঙ্গুনের বাইরে যাবেন। কাজেই তিনি যাবার আগেই আমাদের রেজিমেন্টকে বিদায় অভিনন্দন জানাতে চান। তখন মার্চের শেষ। একদিন সকাল ন'টায় ক্যাম্পের কাছে বড় ময়দানে আমরা সমবেত হলাম। দিনের বেলা বিমানাক্রমণ বড় বেশী না হলেও সাবধানতার দরকার। কাছেই জাপানীদের কয়েকখানা বিমান আকাশে পাহারা দিতে লাগলো। বেলা দশটায় নেতাজী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি প্রথমে সারা রেজিমেন্ট পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর মঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন। মিলিটারী ব্যান্ড বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে পা ফেলে মার্চ শুরু করলাম। তারপর হলো 'জেনারেল অভিবাদন'। তিনি আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করার পর সকলেই নিজ নিজ জায়গাতে ফিরে গেলে, আমাদের কর্তব্য কি তা তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার দ্বারা জানালেন। প্রতিবারের বক্তৃতার মতো তিনি এবারও বললেন, "তোমরা দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হও।" তারপর অফিসারদের আলাদা করে তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে হাসিমুখে করমর্দন করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে নিজেদের যথেষ্ট গৌরবান্বিত মনে করলাম। তিনি খুব জোরের সঙ্গে, বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করলেন। আমরা এগিয়ে চলেছি সুতরাং জীবনে কোনোদিন এমনিভাবে যে আবার মিলতে পারবো সে আশা একেবারেই রাখি না। বললেন, "আপনাদের আমি বিশ্বাস করি তাই হৃদয়ে গভীর আশা রাখি—আপনারা যে কাজে ব্রতী হয়েছেন জীবন পণ করে তা সম্পূর্ণ করবেন। আমি দূরে থাকলেও আমার প্রাণ সর্বদাই আপনাদের পাশে আছে।" সেদিনের সে স্মৃতি জীবনে ভোলবার নয়। প্রায় তিন হাজার সৈন্যের সমবেত "জয় হিন্দ" ও "নেতাজী জিন্দাবাদ" ধ্বনি বার বার আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। অল্পক্ষণ পরে ফিরে এলাম নিজেদের ক্যাম্পে। সেদিন সারাক্ষণ শুধু তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা চললো।

আমাদের যাওয়ার দিন তখনও স্থির হয়নি। ইম্ফলের লড়াই খুব জোর চলছে—যা খবর শোনা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে ইম্ফলের পতনের আর খুব বেশী দেরী নেই। কর্নেল চ্যাটার্জিকে নব-অধিকৃত অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে। সেইজন্য সমস্ত ডাক্তাররা তাঁকে একটি ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। মিয়াং হাসপাতালে আমরাও সেদিন সে সভায় উপস্থিত ছিলাম। যতদূর মনে পড়ে একমাত্র কর্নেল বুরহানউদ্দিন ছাড়া বাইরের অন্য কোনও অফিসার উপস্থিত ছিলেন না। ডাক্তারদের তরফ থেকে কর্নেল রায় তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ডাক্তারদের মধ্য থেকে ইতিপূর্বেই কর্নেল লোগনন্দনকে স্বরাজ ও শহীদ দ্বীপের (আন্দামান ও নিকোবর) গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে। এবারও

একজন ডাক্তারকে সেই মর্যাদা দেওয়াতে আমরা সকলেই খুশী হয়েছি। কর্নেল চ্যাটার্জিও প্রত্যুত্তরে জানান, যে-দায়িত্বপূর্ণ পদে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। তিনি আরো বললেন যে, নেতাজীর উপর অখণ্ড বিশ্বাস রেখে এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে আমাদের কর্তব্য।

তারপর কর্নেল রায় জানান যে, এখানে তিনজন ডাক্তার আছেন, তাঁরাও খুব শীঘ্র ফ্রণ্টে যাচ্ছে; কাজেই এই সুযোগে তাঁদেরও অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি আমাদের 'আজাদ বালক' বলেই ডাকতেন—কারণ আমরা আজাদ রেজিমেন্টের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলাম। ভূরিভোজন ও হাস্য-পরিহাসের মধ্যে রাত প্রায় দশটায় আমাদের সভা ভংগ হলো।

॥ ৪ ॥

এপ্রিলের প্রথম দিকে আমাদের যাত্রা শুরু হলো মান্দালয়ের পথে। এক-একটি ব্যাটেলিয়ান রওনা হতে লাগলো। প্রথমে গেল দু'নম্বর ব্যাটেলিয়ান। তারপর আমার পালা। বিকালের দিকে আমরা স্টেশনের দিকে মার্চ শুরু করলাম। সেদিন ছিল বর্মীদের 'জলোৎসব'। এই যুদ্ধের বাজারেও অনেক বর্মী পিচকারী হাতে পথিকদের গায়ে জল দিয়ে আনন্দ উপভোগ করছিল। সন্ধ্যার আগেই আমরা স্টেশনে পেঁৗছে খানিকটা বিশ্রাম নিলাম।

স্টেশনে কতকগুলি ছোট ছেলেমেয়ে গান গেয়ে পয়সা উপায় করছিল। একটি লোক হারমোনিয়ম বাজাচ্ছিল ও একটি ছোট মেয়ে নেচে নেচে গাইছিল, "দিল্লীমে যানে ওয়ালে মেরা সেলাম লে' যাও" শুনে আমাদের সৈন্যরা খুশি হয়ে তাদের মুক্তহস্তে দান করলো। সন্ধ্যার একটু আগে আমরা প্ল্যাটফরমে এলাম। লীগের তরফ থেকে মিসেস মজুমদার ও অন্যান্য কয়েকজন বাঙালী মহিলা ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা আমাদের প্রত্যেককে চা ও কিছু মিষ্টি খাওয়ালেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারও আমাদের যাওয়ার বন্দোবস্ত করবার ও বিদায় অভিনন্দন জানাবার জন্য স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। মিলিটারী সেক্রেটারী মেজর সায়গল (পরে লেঃ কর্নেল) উপস্থিত ছিলেন। আমি মালয়ে বৃটিশের অধীনে প্রায় এক বছর তাঁর সংগে কাজ করেছিলাম। বহুদিন পরে আবার সাক্ষাৎ হলে খানিকক্ষণ তাঁর সংগে গল্প করলাম। সন্ধ্যার সময় গাড়িতে উঠে বসলাম। চারদিকে শুধু "জয় হিন্দ" "নেতাজী জিন্দাবাদ" ধ্বনির মধ্যে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো মান্দালয়ের পথে। ক্রমশঃ আমরা রণক্ষেত্রের কাছাকাছি এগিয়ে চলেছি। প্রত্যেকেই আনন্দিত, প্রত্যেকেই গর্ব অনুভব করছে যে, খুব শীঘ্রই আমরা ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারবো। যতই এগিয়ে চলেছি ততই প্রাণের মধ্যে জেগে উঠছে অসীম আনন্দ, গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা। একদিন অর্থলোভে বৃটিশের গোলামী করেছি আর আজ চলেছি স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সৈন্য হিসাবে চিরবন্দিতা মায়ের মুক্তি-কামনায়। আগে রণক্ষেত্রের নাম শুনে ভীত হতাম। আর আজ রণক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। অসুস্থতার জন্য বহু সিপাহীকে এখানে রেখে যেতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু তারা যাওয়ার জন্য কত অনুরোধ করেছে। পিছনে থাকতে বাধ্য হয়ে তারা দুঃখ প্রকাশ করেছে। আজ বার বার শুধু সেই বীর সৈনিকদের কথাই মনের মধ্যে জেগে উঠছে।

সারারাত গাড়ি ছুটে চললো। এদিকে কয়লার অভাবে ইঞ্জিন চলে কাঠে, কাজেই অন্য অসুবিধা না হলেও গাড়ির গতিবেগ হয় কিছু কম। ভোরের দিকে গাড়ি থামলো ছোট একটি স্টেশনে। আমরা গাড়ি থেকে নেমে কাছাকাছি একটি গ্রামে আশ্রয় নিলাম সারাদিনের মতো। গ্রামেই রান্নবাড়া সারা হলো। দুপুরে খেয়ে গাছতলায় ঘুম। সন্ধ্যার আগে আবার গাড়িতে এসে উঠলাম। এইভাবে দিনে গ্রামে ও রাত্রিতে গাড়িতে চড়ে পঞ্চম রাতে আমরা মান্দালয় পেঁৗছলাম। পথে গাড়িতে কোন বিপদ হয়নি। রাত প্রায় দুটোর সময় মান্দালয়ের কৃষি কলেজ ক্যাম্পে পেঁৗছলাম। চাঁদিনী রাত। সে রাতের মতো আমরা এখানকার গাছতলাতে আশ্রয় নিলাম। দু'একবার বিমানের ঘর্ঘরধ্বনি কানে এলেও আক্রমণ কোনদিকে হয়নি।

সকালে উঠে এখানকার একটি বাড়িতে আশ্রয় পেলাম। বিকালের দিকে শহরে বেড়াতে গেলাম। প্রত্যেক শহরের যা অবস্থা মান্দালয়ের অবস্থা তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। শহরের মধ্যে একটিও বড় বাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। শুনলাম পিছু হটার সময় সকলের শেষে যায় চীনা সৈন্যরা। আর তারাই সবকিছু শেষ করে দিয়ে যায়। এখানে আসার পর দু'নম্বর ব্যাটেলিয়ানের ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে আবার দেখা হয়। ট্রেনে আমাদের কোনও বিপদ না হলেও তাঁদের ট্রেনের উপর একদিন ভোর বেলা বিমানাক্রমণ হয়েছিল। ক্ষতি খুব বেশী হয়নি, তবে তাঁদের একজন লোক মারা যায়। এখান থেকে ৪৮ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর মেমিওতে আমাদের একটি হাসপাতাল কাজ করছে। তখন তার কম্যান্ডিং অফিসার ছিলেন মেজর (পরে লেঃ কর্নেল) বাওয়া। এ ক্যাম্পটি শহরের প্রায় বাইরে। চারিদিকে খোলা মাঠ। মাঝে কৃষি কলেজের প্রকাণ্ড বাড়ি। বাড়িটি খালি। আমরা আশপাশের বাংলোগুলি অধিকার করেছিলাম। মান্দালয়ে মাত্র দশ-বারো দিন ছিলাম। একদিন বিকালবেলা সকলকে কলেরা প্রতিষেধক ইন্‌জেকশন দিচ্ছি এমন সময় শুনলাম নেতাজী আমাদের ক্যাম্পে এসেছেন। এরকম হঠাৎ তিনি প্রায় সব জায়গাতেই হাজির হন; কাজেই এতে আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। খানিকক্ষণ পরেই তিনি আমার কাছে এসে পড়লেন এবং রুগীদের বিষয়ে দু'চারটা কথা জিজ্ঞাসা করে চলে গেলেন। পরে সন্ধ্যায় কর্নেল গুলজারা সিং সাহেবের মুখে শুনলাম, ক্যাম্পে আসার আগে তিনি কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে স্থানীয় জেলখানা পরিদর্শন করে এসেছেন। সেখানে তাঁর জীবনের কয়েকটি বছর অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি যে ঘরে থাকতেন তা দেখিয়েছেন। সেখানে তাঁর সুবিধার জন্য একটি কুয়ো কাটানো হয়েছিল, সেটি আজও আছে। মান্দালয়ের জেলখানা এখানকার দুর্গের ভিতরে। এক বর্গ ক্রোশ ব্যাপী সুদৃঢ় প্রাচীর দেওয়া দুর্গের ভিতরে আছে প্রাসাদ। বর্মার শেষ রাজা থিবো এখানেই বাস করতেন। দুর্গটি স্টেশনের কাছেই; আর রেল লাইন একেবারে ভিতর পর্যন্ত চলে গেছে। দুর্গের কাছেই 'মান্দালয় হিল'-এর উপর খুব সুন্দর প্যাগোডা আছে।

বেলা দুটোর সময় আমরা নদীর ঘাটে এসে পেঁছিলাম। ইরাবতী বর্মার সবচেয়ে বড় নদী। আগে এর উপর পুল ছিল কিন্তু এখন পুলটি ভাঙা, কাজেই আমাদের ফেরী স্টিমারে নদী পার হয়ে ওপারে যেতে হলো। ওপারেই হচ্ছে সাগাঁই। বর্মাকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—আপার বর্মা ও লোয়ার বর্মা। সাগাঁই থেকে আপার বর্মা শুরু। সাগাঁইএ বাজারের কাছাকাছি আমাদের ক্যাম্প। তিনদিন এখানে ছিলাম। চতুর্থ দিনে এখান থেকে যাত্রা। স্টেশনটিতে যে কতবার কত বোমা পড়েছে তার ইয়ত্তা নেই। লাইনের উপর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে; প্ল্যাটফর্ম বা স্টেশনবাড়ি কিছুই নেই। সন্ধ্যায় গাড়ি চড়লাম, আবার ভোরের বেলায় নামলাম। কাছেই একটি প্যাগোডা ছিল। আমরা কয়েকজন সেখানেই আশ্রয় নিলাম বিরাট এক তেঁতুল গাছের তলায়। সন্ধ্যায় আবার গাড়িতে। মাঝে এক জায়গায় পুল ভেঙেছিল তাই খানিকটা পথ হেঁটেই পাড়ি দিতে হলো। তারপর ওদিকে থেকে আবার আলাদা গাড়ি। রাতে দু'বার বৃটিশ বিমানের আওয়াজ পেয়েছিলাম। গাড়ি থামলে আমরা আশেপাশে নালা বা গাছতলায় আশ্রয় নিলাম। আলোক বোমা (flare) অনেকগুলি পড়েছিল তবে সৌভাগ্যবশতঃ আমাদের গাড়িটি আলোকে ধরা পড়েনি। খানিকটা লুকোচুরি খেলা হলো আর কি। ঘণ্টাখানেক বাদে আবার গাড়ি চলতে লাগলো। তৃতীয় দিনে আমরা এদিককার শেষ স্টেশন ইউ (Yeu) এসে পেঁছিলাম। স্টেশন থেকে প্রায় এক মাইল দূরে একটি পরিত্যক্ত গ্রামে আমাদের থাকার জায়গা স্থির হলো। এখানে সুবিধা এই ছিল যে, খুব কাছে জল। ক্যাম্প থেকে প্রায় আধ মাইল দূর দিয়ে বয়ে চলেছে ছোট্ট 'মু' (Mu) নদী। জল তাতে খুবই অল্প—এত অল্প যে মাথায় জল ঢেলে স্নান করতে হয়। তবে জল খুব পরিষ্কার। এখানে সবচেয়ে বড় অসুবিধে হচ্ছে ঘন ঘন বিমানের আবির্ভাব। একেবারে যেন মাটি ছুঁয়ে হঠাৎ এসে পড়ে, কোন্ দিক থেকে কিছুই বোঝা যায় না। আমরা 'ট্রেঞ্চ' কেটেছিলাম, তাতেই আশ্রয় নিতাম। নদীর ওপারে আমাদের একটি 'মোটর ট্রান্সপোর্ট' কোম্পানী থাকতো। তারা একটি জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল; সেদিকে দু'দিন কিছু কিছু বোমা পড়েছে, কিন্তু কারো ক্ষতি

হয়নি। এখানকার লোকজন ভয়ে দূরে দূরে জঙ্গলের মাঝে আশ্রয় নিয়েছে। শহরে দু'চার ঘর বর্মী বসবাস করে। আমরা এখানে কয়েকদিন থাকতে বাধ্য হলাম, তার কারণ হচ্ছে আমাদের পুরো রেজিমেন্টের এখানে জমা হওয়ার কথা। এখানে টাটকা সবজি খুব কম পাওয়া যেতো। আমরা পেতাম বস্তা বস্তা শুধু আলু আর পেঁয়াজ। সকলের এসে জমা হতে প্রায় পনের দিন কেটে গেল। শুনলাম ইম্ফলের পতন হতে আর বেশী দেরী নেই; আমরা হয়তো একেবারে সোজা গিয়ে ইম্ফলে উপস্থিত হতে পারবো।

এখান থেকেই আমাদের হাঁটাপথ শুরু হচ্ছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা আবার পিঠে লটবহর বেঁধে পট্টি পরে রওনা হলাম ইম্ফলের পথে। আমাদের যে ক'টি লরী ছিল সেগুলিতে খাবার জিনিস পাঠানো হতে লাগলো। প্রথম দিনে হাঁটা হলো প্রায় তের মাইল পথ। একে অন্ধকার রাত তার উপর অল্পক্ষণ পরে শুরু হলো বৃষ্টি। 'অগ্রগামী দল' আমাদের থাকার জায়গার বন্দোবস্ত করেছিল। কাজেই পেঁছানোর পর ভিজে জামা কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম নিতে বেশী দেরী হলো না। সারাদিন এখানেই পড়ে রইলাম। আবার ঠিক সন্ধ্যার সময় চলা শুরু। এখন থেকে প্রকৃতপক্ষে আমরা একেবারে 'নিশাচর' হয়ে উঠলাম। দ্বিতীয় দিনেও প্রায় বারো মাইল পথ বহু কষ্টে অতিক্রম করলাম। সবে তো যাত্রা শুরু কিন্তু আমাদের অবস্থা তাতেই শোচনীয়। একে গরম তার উপর পথের ধারে জলের অভাব। এই পথে বর্মা থেকে বহু সিভিলিয়ান ভারতবর্ষে ফিরে যাবার আশায় পথে প্রাণ হারিয়েছে। আমাদের পক্ষেই এই পথ অতিক্রম করা যখন এতটা কষ্টকর, তখন নারী ও শিশুদের নিয়ে সাধারণ গৃহস্থেরা যে কতটা কষ্ট ভুগেছে, কি রকম অসহায় অবস্থায় পথের মাঝে প্রাণ হারিয়েছে তা চিন্তা করা কল্পনারও অতীত।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায়· আবার চলা। দু'দিনের পথ চলাতে শুধু পা দু'খানি নয়, সারা শরীর একেবারে অবশ হয়ে গেছে। পা আর চলতে চায় না। সামনে তাকিয়ে মনে হয় এখনও তো বহু দূর যেতে হবে—এত শীঘ্র এত ক্লান্তি! মনে উৎসাহ আনার চেষ্টা করি। সিপাহী-দের মধ্যে কেউ কেউ পরিহাস করে গান ধরে—'দিল্লীমে যানেওয়ালে—মেরা সামান লে যাও," কারণ সবচেয়ে কষ্টকর হচ্ছে পিঠের এই বোঝাটি। তারপর তাদের সঙ্গে আছে রাইফেল, মেসিনগান, ব্রেনগান ও ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান। নিজের জিনিসপত্র ছাড়াও এগুলি তাদের বহন করতে হচ্ছে। প্রথম দু'দিনে বিশ্রামস্থান ছিল গ্রাম। এবার থেকে শুরু হলো জঙ্গল। যে জঙ্গলের পাশে জল আছে সেখানেই আমাদের বিশ্রামের জায়গা করা হচ্ছে। অনেকের পায়ের বুট ইতিমধ্যেই বেশ কষ্ট দিতে শুরু করেছে। পায়ে বড় বড় ফোস্কা পড়ছে। তাদের নুন-জল সেঁকের বন্দোবস্ত করছি। এমনি ভাবে অবিরামগতিতে আমরা চলেছি মুশা-ফিরের মতো। দিনের বেলা গাছতলাতে শয়ন, রাতের বেলা পথ চলা। আধুনিক যুগে এই পায়ে হেঁটে পাঁচশো মাইল চলে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া সত্যই অভিনব ব্যাপার। নেপোলিয়ান বা গ্যারিবল্ডীর পর মনে হয়, আধুনিক যুগে একমাত্র ভারতীয় জাতীয় বাহিনীই দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটেছে। অনেকে পথশ্রমে কাতর হয়েছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আবার অনেকে সকল দুঃখকষ্ট তুচ্ছ করে জাতীয় সঙ্গীত গাইতে গাইতে হাসিমুখে পা বাড়িয়েছে। অসুবিধা হতো তাদের নিয়ে যারা খানিক পথ চলার পর আর চলতে পারতো না—পথের ধারেই বসে পড়তো। তখন যে-সব লরী জাপানীদের রসদ নিয়ে যেতো, তার উপরেই তাদের তুলে দেওয়া হতো। এমনিভাবে প্রায় সাত দিনে আমরা কালেওয়ার কাছে এসে পেঁছলাম। প্রত্যহ চলার জন্য যে ক্লান্তি এসেছিল, দিনদুয়েক বিশ্রাম করে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করলাম। চিন্দুইন নদী পার হওয়ার পর কালেওয়া। আপাততঃ সেখানেই আমাদের বিশ্রামের জায়গা স্থির হলো। রাতের বেলা ফেরীতে নদী পার হতে হবে। এই রাস্তা দিয়ে সৈন্যরা যাতায়াত করে তা বৃটিশের বেশ জানা আছে, কাজেই সারাদিন ও সারারাত কয়েকটি বিমান পাহারা দিচ্ছে। ফেরীর আশেপাশে প্রায় এক মাইল পথ বোমার পর বোমা ফেলে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছে। রাতের আঁধারের সুযোগ নিয়ে আমরা চিন্দুইন নদী পার হয়ে কালেওয়া পেঁছলাম।

এখানে থাকার মতো কোনও বাড়িঘর ছিল না, কাজেই নদীর কাছাকাছি একটি ছোট

জঙ্গলে আশ্রয় নিলাম। এখানকার নদীতে জল খুব বেশী নয়, হেঁটে পার হওয়া যায়, যদিও বর্ষাকালে চিন্‌দুইন ভীষণ রূপ ধারণ করে। আমরা যে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তাতে বড় বড় গাছ ছিল না, ছিল কুঞ্জের মতো ছোট ছোট ঝোপ। এদিকে বিমান আক্রমণ খুব বেশী। সারাদিন দুটি বিমান একেবারে নীচু দিয়ে যাতায়াত করছে। ভাবখানা যেন এই, "কেউ আছ কি? যদি থাকো একবার দাপট দেখিয়ে দিই।" দিনের বেলা নদীতে স্নান করা পর্যন্ত অসম্ভব। আমাদের রেজিমেণ্টের অন্যান্যরা আগেই পেঁছে গেছে। তাছাড়া আজাদ হিন্দ দলের একটি দলও জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। দলের ডাক্তার মেজর চক্রবর্তী ও মেজর রবীন ঘোষ পাহাড়ের মাঝে ট্রেঞ্চ কেটে তাতেই তাঁদের আশ্রয় বা আশ্রম তৈরী করেছেন। এই দলে বেশীর ভাগই হচ্ছে সিভিলিয়ান। দেশ অধিকার করার পর সেখানকার শাসন ও অন্যান্য সমস্ত সুবন্দোবস্তের ভার এই দলের উপর। কাজেই তাতে পুলিশ, ডাক্তার, দোকানদার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি সর্বশ্রেণীর লোকের সমাবেশ। ইম্ফলের পতনের পরই এরা ইম্ফল যাবে, সেইজন্য এখানে একেবারে প্রস্তুত হয়ে আছে। মাঝে মাঝে দুপুরবেলা আমি ও ডাঃ চৌধুরী এই নিরাপদ (?) আশ্রয়ে এসে তাদের আড্ডা জমিয়ে তুলতাম। সন্ধ্যার পর নদীর ধারে মশারি দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা হতো। মাঝে মাঝে কিছু মাছ ধরা পড়লে উপাদেয় ঝালচচ্চড়ী রান্না হতো। সিগারেট শেষ হয়েছিল—নদী পার হয়ে গ্রামে বর্মী সিগারেট অর্থাৎ 'সিলে'র খোঁজ করলাম।

চায়ে চিনির অভাব রেঙ্গুন থেকেই ভোগ করছি, কাজেই খোঁজ করে কিছু গুড় সংগ্রহ করলাম। প্রত্যেকটি জিনিসের দাম অসম্ভব রকম বেশী। সিগার টাকায় দুটি, গুড় একবিশা অর্থাৎ প্রায় দেড় সের—দাম আট-নয় টাকা। কয়েকমাস আগেও বৃটিশ এখানে ছিল। তাড়াতাড়ি যাবার সময় তারা সবকিছু নষ্ট করতে পারেনি, বর্মীরা তাই লুঠ করে লুকিয়ে রেখেছে, আর বেশ চড়া দামে লুকিয়ে বিক্রি করছে। দুই পাউণ্ডের একটিন 'মারগারেন' ত্রিশ টাকায় কিনতে বাধ্য হলাম। আগে আমাদের রান্নাবান্না এক সঙ্গেই হতো, কিন্তু অনেক অসুবিধা থাকাতে এখান থেকে প্রত্যেকে আলাদা রান্নার বন্দোবস্ত করেছে। একটি টিন যাকে জাপানীরা 'হাঙ্গো' বলে, তাতেই ভাত রান্না হতো। একটি টিনে দু'জনের ভাত হতে পারে, আমার আরদালী দিলওয়ারা সিং তাতেই ভাত রান্না করতো, আমাদের দু'জনের জন্য আরেকটিতে হতো ডাল। এখান থেকে সবজি আর কিছু পাওয়া যেতো না। সংগ্রহ করা কয়েকটি মাত্র পেঁয়াজ ছিল, তাই কাঁচা খেতাম। এখান থেকে একটি রাস্তা সোজা টামু গিয়েছে। অন্য একটি রাস্তা গিয়েছে কালেমিও ও 'ফোর্ট হোয়াইট'-এর দিকে।

১৩ই মে তারিখে সন্ধ্যার সময় আবার টামুর পথে 'কদম' বাড়ালাম। এরপরে পথে গ্রামের চিহ্ন নেই বললেই হয়, শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। প্রথম দিন হাঁটলাম তেরো মাইল। পথে কয়েকটি ছোট ছোট নদী পার হলাম—তাতে মাত্র হাঁটুজল। দ্বিতীয় দিন হাঁটলাম প্রায় সতেরো মাইল। এই পথে মোটেই জল ছিল না। কাজেই মাঝ পথে আগে থেকেই জলের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। তৃতীয় দিনে পেঁছলাম ইয়াজিগো—এখানে একদিন বিশ্রাম করা গেল। কাছেই শুকনো নদীর আশেপাশে অল্প অল্প জল জমেছিল। তাতে অনেক ছোট ছোট মাছ দেখে মশারি দিয়ে তার কতক ধরলাম। অনেকেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কয়েকজন অফিসার তো চলতে প্রায় অক্ষম হয়ে পড়লেন। তাদের জন্য জাপানী লরীর ব্যবস্থা হলো। আমার নিজের অবস্থাও তত সুবিধের নয়, অথচ দলের সঙ্গে একজন ডাক্তার থাকা চাই-ই, কারণ কখন কি বিপদ ঘটে কিছু বলা যায় না। কাজেই ক্ষমতায় না কুলালেও বাধ্য হয়েই চলতে লাগলাম। আত্মসম্মান ও মনের জোরই আমাকে সাহায্য করেছে এই দীর্ঘপথ চলতে। পথের দু'ধারে বৃটিশের নানারকম খাবারের খালি টিন। অনেক ট্রেঞ্চ। জঙ্গলে মাইন লাগিয়ে গেছে। সব মাইন এখনও সাফ করা হয়ে ওঠেনি। কাজেই জঙ্গলগুলি মোটেই নিরাপদ নয়। আমাদের সঙ্গে পথে বহু জাপানীর দেখা হতো। সময় সময় আমরা একই জঙ্গলে দিনে বিশ্রাম করতাম। আমাদের দোভাষী ছাড়া অন্যেরা খুব কমই জাপানী ভাষা জানতো, তবু দেখতাম তারা জাপানীদের সঙ্গে বেশ আসর

জমিয়ে বসে বসে গল্প করছে। 'ল' জাপানীরা উচ্চারণ করতে পারতো না, জিজ্ঞাসা করতো 'ইম্ফারু'? আমাদের লোকেরা বলতো, ইম্ফল। অর্থাৎ 'তোমরাও ইম্ফল যাচ্ছ কিনা।' আমাদের জাতীয় বাহিনীকে জাপানী ভাষায় বলা হতো 'ইণ্ডো কোকো মিনগুণ' অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় বাহিনী। তবে চলতি ভাষায় 'চন্দ্র বোস'ই যথেষ্ট ছিল। সুভাষচন্দ্রকে তারা শুধু 'চন্দ্র বোস' ও রাসবিহারী বসুকে 'বিহারী বসু' বলতো। মাঝে মাঝে জাপানী অফিসাররা এসে আমাদের সঙ্গে গল্প করতো। এইভাবে পথে কয়েকজন জাপানী ডাক্তারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। অফিসারেরা প্রায় অনেকেই অল্প অল্প ইংরেজী জানে, কাজেই আমার ভাঙ্গা জাপানী ও ইংরেজী মিলিয়ে তাদের সঙ্গে গল্প করতে বিশেষ অসুবিধা হতো না। নেতাজীকে জাপানীরা প্রত্যেকেই যথেষ্ট সম্মান করতো। এমন কি আমি একজন অফিসারকে বলতে শুনেছি: "He is a great man. I can die thousand times if I can once shake hand with him." অর্থাৎ তিনি মহান্ ব্যক্তি। একবার তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে পেলে আমি হাজার বার মরতেও কুণ্ঠিত নই।

গান্ধীজীর নাম তারা প্রত্যেকে জানে, এমন কি তাঁর ফটোর সঙ্গে তারা এত পরিচিত যে, মুণ্ডিত ও টিকিওয়ালা মাথা দেখলেই জিজ্ঞাসা করতো 'গান্‌জি কা?' আমাদের সৈন্যদলকে তারা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতো। পথে তারা নানা প্রকারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এই ভাবে নানা কষ্ট সহ্য করতে করতে একুশ তারিখে আমরা ওয়াটাক (Watak) এসে পৌঁছলাম। এখান থেকে কাছেই টামু, তাই প্রাণে যথেষ্ট ভরসা এল। টামু হচ্ছে বর্মা ও আসামের সীমান্তে। রাতে আবার চলা শুরু হলো—এসে পৌঁছলাম 'পনথা'। পনথা থেকে টামু মাত্র সাত মাইল পথ। দিনের বেলা খুব জোরে বৃষ্টি শুরু হলো। সন্ধ্যার সময় সে বৃষ্টি থামলো না। আমরা গাছতলাতেই ছিলাম। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার কোনও উপায় ছিল না। গায়ে বর্ষাতি জড়িয়ে যতটা সম্ভব নিজেকে বাঁচালাম। সন্ধ্যায় বৃষ্টিতেই চলতে শুরু করলাম। ঘোর অন্ধকার। তার উপর বৃষ্টি। দুই হাত আগে পর্যন্ত নজর চলে না। রাস্তা একেবারে পিছল। চলতে চলতে পথে যে কতবার আছাড় খেতে হয়েছে তার হিসাব নেই, তবে কেউ আহত হয়নি। জলকাদায় ভিজে রাত প্রায় তিনটার সময় টামু পৌঁছলাম। কয়েকটি খালি বাংলো ছিল, রাতের মতো সেখানেই আশ্রয় নিলাম। শরীর অবশ—কাপড়-জামা ছাড়ব—তাও যেন কষ্টকর। তবু তার মধ্যেই যতটা সম্ভব আরামে শুয়ে পড়লাম। ভোর হবার আগেই জঙ্গলে যেতে হবে, কারণ দিনের বেলা বাড়ির মধ্যে থাকা এখানে মোটেই নিরাপদ নয়।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই কাছাকাছি জঙ্গলে আশ্রয় নিলাম। জঙ্গলটি বেশ বড়। তাতে অনেক বড় বড় গাছ। মধ্যে একটি সরু নালা। আমাদের সঙ্গে তাঁবু বাঁধার কোনও বন্দোবস্ত ছিল না। কাজেই নিজের নিজের বর্ষাতি দিয়ে মাথা গোঁজবার মতো জায়গার উপর আবরণ দেওয়া হলো। দু'দিন বৃষ্টিতে মাটি একেবারে ভিজে গেছে, তার উপরেই বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিতে হলো। যে কয়খানি বাংলো খালি ছিল তার মধ্যে দু'টিতে আমাদের অস্থায়ী হাসপাতাল খুললাম। দিনের বেলাটা একরকম কেটে গেল। রাতে কোনও রকমে শালপাতা বিছিয়ে শুয়েছি আর অমনি মুষলধারে নামলো বৃষ্টি। উঠে বসে বর্ষাতি গায়ে দিয়ে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। সারারাত ভিজলাম। সকালের দিকে একটু কমলো, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কম্প দিয়ে এল জ্বর। জঙ্গলে থাকা আর মোটেই নিরাপদ নয়, কাজেই হাসপাতাল-বাংলোতে এসে আশ্রয় নিলাম। ডাক্তার সেখানে তখন আর কেউ ছিল না। নিজের চিকিৎসা নিজেই চালাতে লাগলাম। 'এটিব্রিন' আমাদের যথেষ্ট ছিল, তাই দিয়ে শুরু করলাম। দু'একদিনের মধ্যে ডাঃ চৌধুরী ও ডাঃ প্রশারকর এসে পৌঁছলেন। বিমানগুলি দিনরাত খুব ঘোরাঘুরি করলেও হয়তো তখন পর্যন্ত আমাদের অবস্থান জানতে পারেনি, কাজেই আক্রমণ শুরু হয়নি।

টামু হচ্ছে একেবারে সীমান্ত শহর। অবশ্য শহর একে বলা চলে না, তবু খানকতক বাংলো পড়ে আছে। বর্মীরা থাকে দূরে গ্রামে। কাছেই একটি পার্বত্য নদী। নদী পার হয়েই 'মোরে'। মোরে'র অল্প দূরে একটি পাথরে লেখা আছে, 'আসাম—বর্মা', অর্থাৎ

এইস্থান থেকেই ভারতবর্ষ শুরু। পবিত্র ভারতভূমির সীমার মধ্যে পৌঁছে এক অভিনব আনন্দ পেলাম। বহুদিন পর আবার দেশের মাটির উপর পা রাখলাম। মনে মনে ভারত-জননীকে করলাম বন্দনা।

জ্বরের জন্য কয়েকদিন টামুতেই থাকতে বাধ্য হলাম। কাছাকাছি অল্প অল্প ঘোরাঘুরি করতাম। ঠিক নদীর ধারে বৃটিশের পরিত্যক্ত বড় বড় অনেক ট্রেঞ্চ। এখানে আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের দু'টি দল অপেক্ষা করছে ইম্ফল যাবার আশায়। একটি ইন্‌জি-নিয়ারিং কোম্পানী—যার ক্যাপ্টেন ডাক্তার সনৎকুমার মল্লিক। তাঁর সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা। আমাদের পুরাতন মল্লিকদা। মাঝে মাঝে দুপুরবেলা এখানে এসে খেতাম ও সারাটা দিন গল্প গুজবে কাটাতাম। নদীর ধারে অনেক জায়গাতে কাঁটানটের গাছ হয়েছিল, তাই তুলে শাকগুলি ভাজা করে খেতাম আর ডাঁটাগুলি ডালে দিয়ে রান্না করতাম। বলা বাহুল্য আমাদের এই রান্না তরকারি যা উপাদেয় হতো! বাড়ির সবচেয়ে ভালো রান্নাও হয়তো এতটা আনন্দের সঙ্গে কোনদিন খাইনি। মোরে-তে যে আজাদ হিন্দ দল ছিল তারা এখানকার গ্রামের বর্মীদের কাছ থেকে সব রকম জিনিস কিনতো আমাদের ফৌজের জন্য। বৃটিশ এখান থেকেও যাবার সময় সবকিছু সঙ্গে নিতে পারেনি, বা নষ্ট করতে পারেনি। কাজেই বর্মীদের কাছে অনেক জিনিস ছিল। কিন্তু তারা জিনিসগুলো বিক্রয় করতো বড় গোপনে, কারণ জাপানীরা জানতে পারলে তা লুঠ করে নেবে এই ভয় তাদের ছিল।

আটা, চিনি, ঘি, সিগারেট সবকিছুই এদের কাছে পাওয়া যেতো। সিগারেট একটির দাম এক টাকা, অর্থাৎ প্যাকেট দশ টাকা। এখানকার বড় বড় ট্রেঞ্চের পাশে যে বালির বস্তা ছিল তার মধ্যে সবগুলিতেই বালি ছিল না, অনেক বস্তার মধ্যে আটাও ছিল। বৃটিশরা যে কতটা আরামপ্রিয় তা এখানকার ট্রেঞ্চগুলি দেখলেই বুঝতে পারা যায়। বড় বড় ট্রেঞ্চ-গুলির মধ্যে তারা বিজলীর বন্দোবস্ত পর্যন্ত করেছিল। আসবাবপত্রের অভাবও ছিল না। বৃষ্টিতে অসুবিধা হতো বলে আমাদের সৈন্যরা জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বৃটিশের পরিত্যক্ত ত্রিপল খুঁজে নিয়ে এসে তাতেই তাঁবু তৈরী করতো। অনেকে ভাগ্যক্রমে জঙ্গলে গিয়ে ঘিয়ের টিন ও আটার বস্তা পেতো।

আমি যে বাংলোটাতে থাকতাম তার কাছেই একটি বড় গাছতলায় দিনের বেলা আশ্রয় নিতাম বিমানাক্রমণের সময়। সেই গাছতলাতে অনেক বাজে কাগজপত্রের মধ্যে কয়েকখানি বাংলা চিঠি আবিষ্কার করি। তাতে বাংলা দেশের বর্তমান অবস্থা যে কতটা শোচনীয় তা বুঝতে পারি। চট্টগ্রাম থেকে একটি শিক্ষিতা মেয়ে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেনঃ "দেশের অবস্থা বড়ই খারাপ। চারদিকে চুরি ডাকাতি লেগেই আছে। জমিতে তরি-তরকারি পর্যন্ত রাখা অসম্ভব। ভিক্ষা সকলেই চায়। না খেতে পেয়ে দেশের কুকুরগুলি পর্যন্ত এত হিংস্র হয়ে উঠেছে যে একদিন দুপুরবেলা একটি ছোট ছেলেকে আক্রমণ করে। গ্রামের লোকেরা এসে পড়াতে সে রক্ষা পায়। টাকায় দেড়সের চাউল।" অবস্থা যে এত শোচনীয়, তা শুধু চিঠিখানা পড়ে বুঝতে পারলাম। কার লেখা ও কাকে লেখা, তা জানতাম না—তবু ভাষাটা প্রাণে আঘাত দিয়েছিল বলেই আজও প্রতিটি কথা স্মরণ আছে। আমাদের দুই নম্বর রেজিমেণ্ট অর্থাৎ গান্ধী রেজিমেণ্ট তখন প্যালেলের কাছাকাছি যুদ্ধ করছে। তাদের রেজিমেণ্টের ডাক্তার মেজর আলী আকবর শাহ তখন মোরে-তে হাসপাতাল খুলে সৈন্যদের চিকিৎসা করছেন। ম্যালেরিয়া আমাশয় প্রভৃতি রোগে নিজেরাই চিকিৎসা করতেন। আহতদের জাপানী হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত ছিল। আমার রেজিমেণ্টাল ডাক্তার মেজর খান রেঙ্গুনেই থেকে গিয়েছিলেন। আমি সবচেয়ে 'সিনিয়ার' হওয়াতে রেজিমেণ্টাল ডাক্তারের কাজ আমাকেই করতে হতো। ডাঃ শাহর সঙ্গে আমাদের রুগীদের সম্বন্ধেও পরামর্শ করে অনেক কিছু বন্দোবস্ত করলাম।

যখন টামু এসেছি, তখন থেকেই জানতাম 'সুভাষ রেজিমেণ্ট' হাকা ফ্রণ্টে লড়াই করছে। এখানে আসার পর 'সুভাষে'র একটি ব্যাটেলিয়ান এখানে এসে পৌঁছায়। তাদের ডাক্তার লেঃ রাও এসে পৌঁছানর পর শুনলাম পুরো 'সুভাষ রেজিমেণ্ট' মাত্র একটি ব্যাটেলিয়ান ছাড়া সবই অবিলম্বে কোহিমা ফ্রণ্টে যাবে। হাকা ফ্রণ্টে 'সুভাষ রেজিমেণ্টে'

বেশ একটি মজার ঘটনা ঘটে। একটি মেথর বৃটিশ পক্ষে ধরা পড়ে। ধরা পড়ার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় 'তোমার পল্টন কি?' সে উত্তরে জানায় 'সুভাষ'। তারা বলে, 'এ তো একজন নেতার নাম।' সে তখন বলে, 'ওসব আমি জানি না। আমাদের বহু পল্টন আছে, যেমন—সুভাষ, গান্ধী, আজাদ, নেহেরু প্রভৃতি।' কোম্পানীর নাম জিজ্ঞাসা করায় সে জানায় 'দীপক'। তারা তাকে নিতান্ত বোকা মনে করে বিশেষ নজর না রাখায় সে আবার নিজের রেজিমেণ্টে পালিয়ে এসে এইসব গল্প শুনায়।

আমাদের রেজিমেণ্ট নাগা পাহাড়ে আস্তানা নিচ্ছে। আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার টামুতেই খাদ্যের বন্দোবস্তের জন্য থেকে গেলেন। আমাদের একজন ডাক্তার সাব-অফিসার মেননকে আমাদের রুগীদের দেখাশোনার ভার দিয়ে এখানেই একটি ছোট হাসপাতাল খোলার বন্দোবস্ত করলাম। বন্দোবস্ত হলো ম্যালেরিয়া ও আমাশার রুগীদের মেনন চিকিৎসা করবেন। আহতদের পাঠাবেন জাপানী হাসপাতালে। খারাপ্ রুগীদেরও যতটা শীঘ্র সম্ভব পিছনে পাঠাবার বন্দোবস্ত তিনি করবেন।

॥ ৫ ॥

আমাদের অন্যান্য ব্যাটেলিয়ান ও রেজিমেণ্ট হেডকোয়ার্টার আগেই 'ফ্রণ্টে' চলে গেছে। অসুস্থতার জন্য আমিই শুধু পিছনে পড়ে ছিলাম। ২রা জুন আমিও এখান থেকে লরী করে চব্বিশ মাইল দূরে মণিপুর রাজ্যের মিন্থা বলে একটি জায়গাতে উপস্থিত হলাম। এখানেও আমাদের কোয়ার্টার মাস্টারের একটি ছোট বিভাগ ছিল। গ্রামে লোক খুব কমই ছিল তবু যারা ছিল তারা সবরকমে আমাদের সাহায্য করতো। একজন মণিপুরী ভদ্রলোক (তিনি বাংলা বেশ ভালো জানতেন) তাঁর বাড়িতে আমাকে আশ্রয় দিলেন। এখানে যে কয় ঘর গ্রামবাসী ছিলেন তাঁরা অনেক গরু পালতেন বলে আমরা খাঁটি দুধ পেতাম। বাইরে থেকে এ গ্রাম একেবারেই খালি মনে হতো। কাজেই বিমানগুলি অনবরত ঘোরাঘুরি করলেও গ্রামের কিছু ক্ষতি করেনি। এখানে আজাদ হিন্দ দলের দু'টি যুবক—একজন গুর্খা পুরী ও অন্যজন শ্রীপতি নাহা—এখানে আমাদের রেজিমেণ্টের তরফ থেকে গ্রামে গ্রামে জিনিস কিনতো। সিগারেটের অভাবটা খুব বেশী ছিল। তারা গ্রাম থেকে তামাক কিংবা বর্মী 'সিলে' বা সিগার কিনে আনতো। আমাদের কিছু সৈন্য এখানে ছিল, আমিও কয়েকদিন এখানে থাকতে বাধ্য হলাম। অনেক বাগানেই আমগাছ ছিল। পেট ভরে পাকা আম খেতাম। জংগলের গাছগুলিতেও খুব সুন্দর পাকা আম ছিল। কাঁঠালও অল্প কিছু ছিল। এখানে মাত্র চারদিন থাকার পর উপর থেকে খবর এল ডাঃ চৌধুরী বিশেষ অসুস্থ, আমি যেন যতশীঘ্র পারি উপরে যাই। দুপুরে খবর পাওয়ার পরই যাত্রা করলাম এবং চার মাইল দূরে ইয়াংকোপি এসে হাজির হলাম। এখানে পাকাপাকিভাবে আমাদের একটি কোম্পানী থাকতো। রাত এখানেই কাটালাম। পরদিন সকাল সকাল খাওয়া সেরে বেলা প্রায় ন'টার সময় পাহাড়ের উপরে ওঠার জন্য তৈরী হলাম। সদ্য ম্যালেরিয়া থেকে সেরে ওঠার জন্য শরীরের দুর্বলতা মোটেই কাটেনি। কাজেই কোম্পানী কম্যাণ্ডার লেঃ প্রিতম সিংকে বললাম, 'একজন লোক দিন যে আমার 'পিঠু'টা উপর পর্যন্ত পেণছে দেবে।' উপরে চার মাইল ওঠার পথে আমাদের একটি ছোট 'রেশন-ডাম্প' ছিল। সেখানে সর্বদা গার্ড থাকতো। লোকটি আমার 'পিঠু' নিয়ে রওনা হয়ে গেল। আমি আস্তে আস্তে পাহাড়ে চড়া আরম্ভ করলাম। এখান থেকে একেবারে সোজা চড়াই। দু'মিনিট চড়লে আবার পাঁচ মিনিট বিশ্রাম নিতে হয়। প্রায় চার ঘণ্টায় চার মাইল পথ অতিকষ্টে অতিক্রম করে 'ডাম্পে' পেণছলাম। সেখানে পেণছানর পর দেখি আমার 'পিঠু'টা প্রায় অর্ধেক খালি। গার্ডকে জিজ্ঞাসা করাতে তারা জানালো যে, তারা ঐভাবেই 'পিঠু'টা পেয়েছে। খুলে দেখি অনেক জিনিস কম। একে পথ-চলার ক্লান্তি, তার উপর শরীরের দুর্বলতা, কাজেই লোকটির উপর ভয়ানক রাগ হলো। আমার আরদালীকে ঐখানে থাকতে বলে আবার নীচে নেমে

এলাম। আসার সময় পথটা উৎরাই, কাজেই প্রায় দেড় ঘণ্টার মধ্যেই 'ইয়াংকোপি' পেঁছিলাম। নীচে পেঁছে সে লোকটিকে হাতে-নাতে ধরলাম। জিনিস সব কিছু তার কাছে পেলাম। অল্প একটু অপেক্ষা করার পর আবার উপরে ওঠার জন্য তৈরী হলাম। অফিসাররা প্রত্যেকেই নিষেধ করলে, বললে, 'ডাক্তার, তোমার শরীর বড় দুর্বল। আজ রাতটা এখানে থেকে কাল সকালে যাবে।' আমার বিশিষ্ট বন্ধু চৌধুরী অসুস্থ, কাজেই আজই না গেলে কর্তব্যের ত্রুটি হবে, এটি তাদের বুঝিয়ে বেলা চারটের সময় আবার উপরে উঠতে লাগলাম। পা দুটো প্রায় অবশ হয়ে এসেছে তবু আস্তে আস্তে প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করতে লাগলাম।

সন্ধ্যার একটু আগে প্রায় তিন মাইল অতিক্রম করেছি এমন সময় কয়েকটি বিমানের আওয়াজ এল। একটি বড় গাছতলাতে বসলাম। বিমানগুলি মাথার উপর বারকয়েক ঘুরেই ভীষণভাবে চালালো মেশিনগান আর বোমা। পাহাড়ের জঙ্গলে তার ভীষণ প্রতিধ্বনি হতে লাগলো। কোথায় যে আক্রমণটা হচ্ছে তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আন্দাজ করেও কিছু ঠাহর হলো না। প্রায় একঘণ্টা পরে বিমানগুলি তাদের কর্তব্য অর্থাৎ ধ্বংসলীলা শেষ করে চলে গেল। আমিও আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম। চাঁদিনী রাত হলেও জঙ্গলের বড় বড় গাছ ভেদ করে চাঁদের আলো নিতান্ত অল্প নীচে আসছিল। সন্ধ্যার অল্প পরে আমাদের 'ডাম্পিং'এ উপস্থিত হলাম। সেখানে আমার আরদালী দিলওয়ারা সিং আগে থেকেই আমার জন্য রান্না সেরে রেখেছিল, খাওয়া শেষ করে গাছতলাতে মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়লাম। সারাদিনের ক্লান্তি, শয়ন মাত্রই নিদ্রা। হঠাৎ বহু কণ্ঠের 'ডাক্তার সাব' 'ডাক্তার সাব' রবে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম-চোখে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। পরে দেখি তারা চারজন আহত লোককে নিয়ে এসেছে উপর থেকে। তাড়াতাড়ি উঠে তাদের পরীক্ষা করতে লাগলাম। একজন আগেই মারা গেছে। আর তিনজনের মধ্যে দু'জনের জ্ঞান আছে, একজন একেবারেই অজ্ঞান। শুনলাম আজ বিকালে উপরে ঠিক আমাদের 'পজিশন'-এর উপর প্রায় একঘণ্টা বিমানহানা হয়েছে। ছ'জন উপরেই মারা গেছে আর চারজন আহতকে নিয়ে তারা আমার কাছে এসেছে। যে দু'জন অজ্ঞান হয়নি, তার মধ্যে একজন শুধু বার বার বলছে, 'হায় নেতাজী, হায় ভগবান, রক্ষা কর'। স্বর শুনেই বুঝলাম বাঙালী। এরা চারজনই আজাদ হিন্দ দলের লোক, তারা আমাদের রেজিমেণ্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। উপরের নার্সিং সিপাহীরা বেশ ভালোভাবে তাদের পট্টি প্রভৃতি বেঁধে দিয়েছিল, কাজেই সেগুলি আর খোলার দরকার হলো না। যে মারা গিয়েছিল, তার নাম মজুমদার। তখনি নীচে লোক পাঠিয়ে দিলাম যেন ভোরের আগেই তারা তিনটি স্ট্রেচার ও আঠারো জন স্ট্রেচারবাহী পাঠিয়ে দেয় আমার কাছে। যে লোকটি অজ্ঞান হয়েছিলেন, শুনলাম, তিনি একজন বড় সিন্ধী ব্যবসায়ী, ম্যানিলা থেকে এসে আজাদ হিন্দ দলে যোগ দিয়েছিলেন। অন্যান্য তিনজন বর্মার সিভিলিয়ান। ভোরের আগেই নীচ থেকে স্ট্রেচারবাহী এসে পেঁছালো। তাদের টামু পর্যন্ত পাঠাবার বন্দোবস্ত করে আমি উপরে উঠতে শুরু করলাম। আজকেও প্রায় তিন মাইল চড়লে তবে আমার হেড কোয়ার্টারে পেঁছতে পারবো। সব পথটাই চড়াই। তারপর গত কাল সারাদিন পাহাড়ে ওঠানাম করে সারা শরীরে ব্যথা হয়েছে। আস্তে আস্তে উঠতে শুরু করলাম। একেবারে সোজা পাহাড়। উপর দিকে সোজা তাকালে মাথা ঘুরে যায়। পাহাড়ে ওঠা জীবনে এই প্রথম। আগে দু'একবার যা চড়েছি, তাতে বেশ সুন্দর রাস্তা ছিল। বেলা প্রায় দশটার সময় আমার হেড কোয়ার্টার 'নারুম' এসে পেঁছলাম। এটি হচ্ছে পাহাড়ের একেবারে শীর্ষদেশে—উচ্চতা প্রায় সাড়ে তিন হাজার ফুট। চৌধুরী এখান থেকে আরও দু'মাইল আগে 'লামিয়াম কুকি' গ্রামে থাকে। পেঁছেই সেখানে যাবার জন্য তৈরী হলাম, কিন্তু কর্নেল সাহেব বললেন, 'খবর পেয়েছি চৌধুরী আজ ভালো আছে। তুমি এবেলা বিশ্রাম করো—বিকেলের দিকে আমরা একসঙ্গে গিয়ে চৌধুরীকে দেখে আসবো।'

এখানে আসার পর গতকালের সমস্ত কাহিনী শুনলাম। পাহাড়ের উপর পরিষ্কার জায়গাতে নাগাদের কয়েকটি খালি বাড়ি ছিল। আমাদের অফিসার ও অন্যান্যেরা কিছু

সেখানেই আশ্রয় নেয়। বিমানগুলি আসার পরও সকলেই ভেবেছিল ওরা অন্যদিকে চলে যাবে, কিন্তু হঠাৎ আক্রমণ শুরু করলো। যারা ঘরের ভিতর ছিল তাদের মধ্যে অনেকেই ছুটে বাইরে জঙ্গলে বেরিয়ে আসে। অনেকে ঘরের ভিতরেই ছিল। ঘরগুলি প্রায় উড়ে গেছে, অনেক গাছ উপড়ে গেছে। চারদিকে রক্তারক্তি কান্ড। যে সিন্ধী ব্যবসায়ীটি আহত হয়েছিলেন, প্রথমে তাঁর বেশ জ্ঞান ছিল কিন্তু মৃত্যু যে আসন্ন তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমার ভাগ্য বড়ই খারাপ, তাই যখনই কাজের সুযোগ পেলাম তখনই মৃত্যু এল!' তাঁর যা কিছু কাপড়-জামা, টাকা-পয়সা ছিল সবই তিনি আমাদের সিপাহীদের দান করেন। সোনার হাতঘড়িটি নেতাজীকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য শেষ অনুরোধ করেন।

এ'দের দেশপ্রেম ও নেতাজীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। মৃত্যু-পথযাত্রীদের মুখে শুনেছি নেতাজীর নাম। মানুষ হয়েও আজ সকলের হৃদয়ে তিনি অধিকার করেছেন দেবতার আসন। মৃত্যুকে কেউ ভয় পায়নি—তবু এত শীঘ্র মৃত্যু বরণ করতে তারা চায়নি। তারা চেয়েছে বেঁচে থাকতে আরো বেশী করে দেশসেবার সুযোগ পাবার জন্য। আমাদের সৈন্যরাও এখানে এসে পেঁছিবার পর খুবই আনন্দিত হয়েছে, কারণ তারা জানে যে এখন তারা ভারতবর্ষের মধ্যে। এখান থেকেই যুদ্ধ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এখানে যারা মৃত্যু বরণ করেছে তাদের প্রাণে এটুকু সান্ত্বনা ছিল যে, তারা দেশের কাজে দেশের মাটির উপরই প্রাণ বিসর্জন করেছে।

বিকালে চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করলাম। ডেঙ্গু জ্বর হয়েছিল। পাঁচদিন একেবারেই জ্বর ছাড়েনি, আজ সকাল থেকে জ্বর ছেড়েছে তবে শরীরের দুর্বলতা খুব বেশী। খানিক গল্প করে সন্ধ্যার আগেই ফিরে এলাম নারুমে।

পাহাড়ের উপর বর্ষা প্রায় লেগেই আছে অথচ থাকার জন্য তাঁবু কিংবা ঘর নেই। তখন উপরের গ্রামের খালি ঘর থেকে বিচালি এনে তাতেই জঙ্গলের মাঝে ছোট ছোট ঘর তৈরি করা হলো। বোমার ভয়ে সকলে এক জায়গাতে থাকা যায় না, তাই দূরে দূরে থাকার ব্যবস্থা হলো। একটি ব্যাটেলিয়ানের থাকার জন্য আমরা প্রায় দু'মাইল জায়গা অধিকার করলাম। ছোট ছোট ঘর, তারই একটির মধ্যে পাঁচ ছ'জন করে লোকের কোন রকমে মাথা গোঁজা চলতে পারে। এখানে জলের বেশ একটু কষ্ট ছিল। এত উপরে জল পাওয়া যায় না। প্রায় সাত আটশো গজ নীচে ঝরণা। সেখান থেকে জল নিয়ে এসেই রান্না ও খাওয়া। স্নান নীচেই সারতে হতো। এত নীচে যাওয়া বেশ কষ্টকর। গাছের ডালপালা ধরে নামতে হয়, আবার গাছের ডালপালা ধরে ধরে তবে উপরে উঠতে হয়। আমার প্রায়ই 'টারজন দি এপ্‌ম্যানে'র কথা মনে পড়তো। জঙ্গলে এসে আমরাও জংলী বনে গেছি।

আমাদের এখান থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু 'সীতাচাঙ্গ' পাহাড়ে বৃটিশের একটি পাকা আস্তানা। রা'তা দিয়ে দশ মাইল হলেও সোজাসুজি মাইল পাঁচ-ছয়ের বেশী হবে না। এখানে বৃটিশের তিন লাইন কাঁটা তার ও পাকা কংক্রিট পিল-বক্স আছে আর সে জায়গাটা পাহারা দিচ্ছে গুর্খা সৈন্যরা। পাহাড়ের উপর থেকে দূরবীণ দিয়ে লক্ষ্য করলে তাদের মাঝে মাঝে দেখা যেতো।

আমরা ইম্ফলের খবরের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন থাকতাম। মাঝে মাঝে খবর আসতো, "তোমরা তৈরী থেকো—হুকুম পেলেই ইম্ফল যাবে।" আমরা যেখানে ছিলাম সেখান থেকে ইম্ফল মাত্র চল্লিশ মাইল পথ, অর্থাৎ আমাদের হাঁটাপথে তিনদিনের পথ। বিষণপুরের রাস্তায় জাপানীরা ও জাতীয় বাহিনীর সৈন্যরা বুড়ীবাজার অধিকার করেছে। উপরের দিকে জাপানী ও সুভাষ রেজিমেণ্ট কোহিমা দখল করেছে। বৃটিশের রাস্তা সবই বন্ধ। বিমানে করেই তাদের রেশন আসছে আর বিমানে করেই তারা সবকিছু কাজ করছে। প্যালেলের দিকে গান্ধী রেজিমেণ্ট বেশ বীরবিক্রমে গেরিলা যুদ্ধ চালাচ্ছে। এ সমস্ত খবর আমরা রোজই পেতাম।

এখানে আসার পর বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমার সৈন্যদের মধ্যে প্রায় সকলেই ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হলো। তারপর শুরু হলো আমাশয়। স্বাস্থ্য প্রায় সকলেরই ভেঙ্গে

পড়লো। তার উপর রেশন হচ্ছে শুধু চাল ও সামান্য এক আউন্স মাত্র ডাল। আশপাশের গ্রামে চেষ্টা করেও কোন রকম শাক-সবজি পাওয়া যেতো না। আমাদের সৈন্যরা এদিকে ঠিক সামনাসামনি লড়াই না করলেও রোজই পেট্রল পার্টি বাইরে যেতো আর চার পাঁচ মাইল দূরে প্রায়ই বৃটিশ ও ভারতীয় সেনার সঙ্গে সংঘর্ষ হতো। জঙ্গল খুব গভীর থাকাতে কোন পক্ষই অপরের সৈন্যসংখ্যা জানতে পারতো না। দু'পক্ষে খানিকক্ষণ অনেক গুলী বিনিময়ের পরেও কোন পক্ষেই কেউ হত বা আহত হতো না। বর্ষাকালে পাহাড়ে বাস করা আর স্বাস্থ্য নষ্ট করা দুইই সমান। তার উপর অলস জীবন যাপন করলে স্বাস্থ্যহানি একেবারে অবধারিত। কাজেই আমি সকালে রুগী দেখার কাজ শেষ করে প্রায় রোজই দুপুরে কাছাকাছি গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম। এখানকার গ্রামগুলি ছোট, অধিবাসী হয় নাগা নয়তো কুকি। এরা তাদের নিজেদের ভাষা ব্যবহার করলেও অনেকে হিন্দুস্থানী এবং বর্মী ভাষাও কিছু কিছু বলতে পারতো। প্রত্যেক গ্রামের প্রধান হচ্ছে সর্দার, তাকে রাজা বলা যায়। রাজার পরে আছে একজন মন্ত্রী। গ্রামের সকলে রাজার ও মন্ত্রীর আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়। অবশ্য রাজা বা মন্ত্রীর সাজপোশাক বা বাড়ি অন্যের তুলনায় মোটেই উন্নত নয়। রাজার বাড়ির বাহিরে নানা জন্তুজানোয়ারের মাথা, শিং প্রভৃতি টাঙানো আছে। শুনেছি, যার বাড়িতে যত বেশী জন্তুর শিং ও হাড় আছে তারই পদমর্যাদা তত বেশী। কোন কিছুর দরকার হলে রাজা বা তাঁর অনুপস্থিতিতে মন্ত্রীকে জানালে তা পাওয়া যেতে পারে। প্রথমে এরা আমাদের দেখে খুব ভয় পেতো কিন্তু পরে আমাদের সঙ্গে মেলামেশার পর এরা আমাদের খুবই পছন্দ করতো। জঙ্গল থেকে পাকা আম এনে বিক্রি করতো আমাদের কাছে। মুরগী বা মুরগীর ডিমও মাঝে মাঝে অল্প অল্প বিক্রি করতো। নাগা ও কুকীদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছুই নেই, তবে শুনেছি যারা চুল সামনের দিকে বাঁধে তারা নাগা আর যারা পিছনের দিকে বাঁধে তারা কুকী। নাগাও সম্প্রদায় হিসাবে বিভিন্ন, সুতরাং তাদের মধ্যে বিবাহাদি হয় না। এরা পাহাড়ের উপরের জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে ধানের চাষ করে। ধান এখানে হয় প্রচুর। এরা সকলেই মণিপুর রাজ্যের প্রজা। বছরে একবার কোনও রাজকর্মচারী গ্রামে আসে। তখন এরা সাধ্যমতো নজর পাঠায়। তারপর সারা বছরের মতো গ্রামের ভিতরের সব ব্যাপারে সর্দারের আধিপত্য। আইন-কানুন যা কিছু সবই তাঁর আদেশে চলে। আমাদের অফিসারদেরও এরা রাজা বলেই ডাকতো। আমরাও রাতারাতি 'রাজা' হয়ে বেশ আমোদ পেতাম। আমাদের কর্নেল সাহেবকে এরা বড় রাজা বলতো। তাঁর সম্মানের জন্য একদিন প্রয় পঁচিশ ত্রিশটি গ্রামের সর্দার একত্র হয়ে 'নজর' নিয়ে এসে উপস্থিত। গোটা পাঁচেক শুকর, প্রায় একশো বোতল তাড়ী, কয়েক ঝুড়ি আম ও কয়েকটি মুরগী। অতি বিনীতভাবে জানালে—'বড় রাজার' জন্য তাদের সামান্য উপহার।

এমনিভাবেই দিন কাটছিল। ভাতের সঙ্গে তরকারির অভাবটা বেশ অনুভব করতাম, কাজেই চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করলাম। কোথাও পেলাম একটা মোচা, কোথাও বা কিছু থোড়। আমার দেখাদেখি পাঞ্জাবীরা পর্যন্ত থোড় খেতে শুরু করলো। তারপর শুরু হলো 'ব্যাঙের ছাতা'। মশলার অভাব, কাজেই সিদ্ধ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। তারপর একটি পাহাড়ে আবিষ্কার করলাম যথেষ্ট কচু। প্রথমটা গলা-ধরার ভয়ে অল্প শুরু হলো। পরে গলা না ধরায় কচুই হলো প্রধান তরকারি। ক্রমে আমাদের রেশন কমে যেতে শুরু করলো। বিশেষ করে নুন কমে যাওয়াতে আমরা বিশেষ কষ্ট অনুভব করতাম। মাঝে মাঝে নাগাদের কাছ থেকে কাঁচালঙ্কা যোগাড় করতাম। তরকারি তো না খাওয়ার মধ্যে, কাজেই ভাতের সঙ্গে একটু নুন ও কাঁচা লঙ্কা পেলেই আমরা খুব আনন্দিত হতাম। মনে করতাম এ তো রাজভোগ! ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ সব কিছুই খেতে পারে তা এখানে বেশ ভালোভাবেই অনুভব করতে পারতাম।

আমি কচুর তরকারি করে খাচ্ছি, ক্রমে সকলেই এ খবর জানতে পারলে, তারাও সকলে তরকারিতে কচু ব্যবহার করতে লাগলো। ক্রমে আমাদের রেশন কমে আসতে লাগলো। শুনলাম বর্ষার দরুন পার্বত্য নদীগুলিতে বান এসেছে, লরীর রাস্তা একেবারেই বন্ধ।

আমাদের টামুর কোয়ার্টার-মাস্টার অনেক খোঁজাখুঁজি করে কিছু ধান সংগ্রহ করেছিলেন। আমাদের লোকেরা প্রায় পঁয়ত্রিশ মাইল দূর টামু থেকে সেই ধান মাথায় করে বয়ে নিয়ে আসতো। যাতায়াতে প্রায় ছ'দিন সময় লাগতো। তখন ভীষণ বর্ষা শুরু হয়েছে—ধান তখন উপরে অংকুর বেরিয়ে পড়তো। তবু সেই ধান আগুনে গরম করে লোহার টুপীতে কুটে চাল বের করা হতো! সেই চালের ভাত খেয়ে আমাদের জাতীয় বাহিনীর সৈন্যরা অসুস্থ শরীরে যুদ্ধ করেছে। বৃটিশ তরফের সৈন্যরা হয়তো ধারণাও করতে পারবে না, এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও মানুষ কি করে যুদ্ধ করতে পারে। কিন্তু আমাদের সৈন্যরা অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেছিল—তার কারণ, তাদের মধ্যে ছিল সত্যিকারের দেশপ্রেম। তারা জানতো—তারা হচ্ছে ভারতের মুক্তিফৌজ। এখানে নানা অসুবিধার মধ্যেই তাদের যুদ্ধ করতে হবে। 'ফ্রণ্টে' আসার আগে নেতাজী বলেছিলেন—"হে আমার বীর সৈনিকগণ! তোমাদের যুদ্ধে পাঠাচ্ছি। আমাদের আয়োজন কম। কাজেই তোমাদের ভালো খাবার খেতে, বা ভালো কাপড় জামা পরতে দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি শুধু তোমাদের দিতে পারি—ক্ষুধা, কষ্ট, দুঃখ। তা তোমাদের সহ্য করতে হবে, মৃত্যুকে বরণ করতে হবে। যারা সক্ষম তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে যাও। আর যারা মনে করো এ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা অসম্ভব তাদের আমি দোষ দিই না। তারা পিছনে কাজ করবে। আমি তাদের পিছনে রাখবো।"—সব কিছু জেনেও কেউ পিছনে থাকতে রাজী হয়নি। কাজেই প্রাণে যে উদ্দীপনা নিয়ে তারা এগিয়ে এসেছে, অসহনীয় হলেও তা সহ্য করে এগিয়ে যেতে হবে, তা না হলে যে দেশবাসীর কাছে—নেতাজীর কাছে তাদের মর্যাদা থাকে না।

আমাদের 'পেট্রল পার্টি' চার পাঁচ মাইল দূরে গেলেই মাঝে মাঝে বৃটিশের ভারতীয় 'পেট্রল পার্টি'র সঙ্গে দেখা হতো। দু'পক্ষই প্রথমে খানিকটা 'প্রোপাগাণ্ডা' করতো। যেমন, বৃটিশের দিকের সৈন্যরা বলতো, "তোমরা কেন অনাহারে জাপানীদের সঙ্গে কষ্ট পাচ্ছ? আমাদের দিকে এসে যোগদান করো। আগে তোমরা বৃটিশের পক্ষ হয়ে লড়েছ, এখন বিপক্ষে লড়াই করা শোভা পায় না।"—প্রভৃতি। আমাদের পক্ষের লোকেরাও তাদের বলতো, "কেন তোমরা বৃটিশের গোলামী করছ? শুধু তো পেটের দায়ে! আমরা হচ্ছি আজাদ গভর্ণ-মেণ্টের আজাদ সেনা। আমরা লড়ছি স্বাধীনতার জন্য। তোমরা ভারতীয়, আমাদের ভাই, এসো, আমাদের সঙ্গে যোগদান করো, আমরা একসঙ্গে মিলে বৃটিশকে তাড়িয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি!" তারপর চলতো গালাগালি—পরে চলতো গোলাগুলী।

যেখানে এইভাবে মাঝে মাঝে 'পেট্রল পার্টি'র দেখা হতো সেখানে একটি বেশ মজার ঘটনা প্রায়ই ঘটতো, যাকে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলা যেতে পারে। সেখানে একটি গাছের ডালে অস্থায়ী একটি ডাক-বাক্সের মতো তৈরী করা হয়েছিল। দু'পক্ষ থেকেই সেখানে 'প্রোপাগাণ্ডা' চিঠি টাঙিয়ে রাখা হতো—আর দু'পক্ষই তা পড়ে উত্তর দিতো।—এরকম অনেক চিঠি আমরা পেয়েছি। তার মধ্যে কতকগুলি বেশ ভালোভাবেই লেখা থাকতো আর কতকগুলি থাকতো গালাগালিতে পূর্ণ। চিঠিগুলি প্রায় এই ধরনের হতোঃ—"তোমরা স্বাধীনতার কথা বলছ, কিন্তু আমাদের দেশে স্বাধীনতার কথা ভাবাও যেতে পারে না। কেননা আমরা সঙ্ঘবদ্ধ নই। *** বৃটিশ বিশেষ শক্তিশালী। তাদের সতেরো ডিভিশন সৈন্য শুধু ইম্ফল ফ্রণ্টেই লড়াই করছে *** তোমরা সংখ্যায় একেবারে মুষ্টিমেয়। দেশপ্রেম আমাদেরও আছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘরের কথাও চিন্তা করতে হয়। তোমরা যে সুযোগে রাতারাতি দেশভক্ত হয়ে উঠেছ, সুযোগ ও সুবিধা পেলে আমরাও তা হতে পারি। তবে বর্তমানে তা সম্ভবপর নয়।" উত্তর হতো—"আমরা যে সঙ্ঘবদ্ধ নই—এটা আমাদেরই দোষ। তা ছাড়া বাইরের একটি পক্ষ আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে দেয় না। সুযোগ পেলে আমরাও সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারি—তার নমুনা হচ্ছে পূর্ব এশিয়ার ত্রিশ লক্ষ ভারতীয় আজ একতাবদ্ধ। বৃটিশ যদি এতই শক্তিশালী তবে মাত্র দু'মাসের যুদ্ধে সে মালয় কেন হারালো? বর্মা ছেড়েছে কেন? আমরা মোটেই জাপানীদের সাহায্য করছি না বরং জাপনীরাই আমাদের সাহায্য করছে। আমাদের জাতীয় বাহিনী আমাদেরই দেশপূজ্য নেতা নেতাজী সুভাষ বসুর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। আমরা স্বাধীন।"

গালাগালির চিঠিরও একটি নমুনা দি—"তোমরা নিমক-হারাম। বৃটিশের পক্ষ ত্যাগ করে আজ জাপানী পক্ষে লড়ছ! আজও সদাশয় বৃটিশ তোমাদের বাড়িতে টাকা পাঠাচ্ছে। তোমরা জাতি, ধর্ম ভুলে দিয়ে জাপানীদের সঙ্গে ম্লেচ্ছ হয়েছ। এতদিন যাদের নুন খেয়েছ আজ তাদের বিরোধিতা করা উচিত নয়।" প্রভৃতি।

এমনি ধারা আমরা প্রায়ই চিঠি পেতাম আর তার উত্তরও দিতাম। আশ্চর্য এই যে, অন্য সময়ে লড়াই হলেও চিঠি দেবার বা নেবার সময় কোন পক্ষই আক্রমণ করতো না। আমাদের সৈন্যরা জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধ করতো। জঙ্গল ভেদ করে কম্পাস দ্বারা রাস্তা নির্ণয় করে শত্রুসৈন্যের পশ্চাতে উপস্থিত হয়ে তাদের পুল উড়িয়ে দিতো—টেলিফোনের তার প্রভৃতি কেটে দিতো—রসদ লুঠ করতো। সাধারণত সামনাসামনি যুদ্ধ এড়িয়ে চললেও মাঝে মাঝে খণ্ডযুদ্ধ হতো। আমাদের সৈন্যরা অল্প কিছুক্ষণ গুলী চালানোর পরই একেবারে 'চলো দিল্লী' বলে শত্রুসৈন্যদের উপর উন্মুক্ত বেয়োনেট নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়তো। শেষে বৃটিশ পক্ষ আমাদের এত ভয় খেতো যে আমাদের সৈন্যদের দেখলেই বলতো—'চলো, দিল্লীওয়ালা আ গিয়া—আভি পিছে হটো।' তাদের আক্রমণের বেগ অধিকাংশ সময়ই শত্রুরা সহ্য করতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়তো এবং জঙ্গলে নানাদিকে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করতো।

একদিনের ঘটনা। আমাদের দু'নম্বর ব্যাটেলিয়ানের একজন জাঠ অফিসার রণপৎ সিং কিছু সৈন্য নিয়ে পেট্রল পার্টিতে যায়। কিছুদূর যাওয়ার পর পাহাড়ের উপরে এক জায়গাতে শত্রুসৈন্য দেখা যায়। রণপৎ কিছুমাত্র ভীত না হয়ে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের হুকুম দেয় 'চার্জ', অর্থাৎ বেয়োনেট দ্বারা আক্রমণ করো। সৈন্যেরা 'চলো দিল্লী', 'হিন্দুস্থান আজাদ', 'নেতাজী জিন্দাবাদ' প্রভৃতি ধ্বনি সহকারে শত্রুদের তাড়া করে। রণপৎ সকলের আগে ছিল, হঠাৎ তার বুকে টমিগানের গুলী লাগে ও পড়ে যায়। তখন ইন্দর সিং নামে এক হাবিলদার কিছুমাত্র ইতস্তত না করেই শত্রুদের তাড়া করে। সেই পাহাড় থেকে শত্রুদের একেবারে তাড়িয়ে তবে ইন্দর সিং ফিরে আসে, রণপতের মৃতদেহের কাছে। পার্টি কম্যান্ডার মারা যাওয়াতে সকলেই নিতান্ত দুঃখিত মনে ফিরে আসে। যথাবিধি সামরিক কায়দায় তার মৃতদেহ 'লামিয়াম কুকী' গ্রামের কাছাকাছি এক জায়গায় সমাহিত করা হয়। নির্ভীক বীরের মৃত্যুতে দুঃখিত হলেও সকলে সেদিন গৌরব অনুভব করেছে, তার আত্মদানে। দিল্লীর পথে অজ্ঞাত স্থানে সেই বীর শহীদ আজও চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। মনে পড়ে আমরা ছেলেবেলায় 'জন মুরের সমাধি' নামে এক ইংরাজী কবিতা পড়েছিলাম।—আমরা তার জন্য কোন স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তুলিনি—তাকে ঠিক মর্যাদা দেবার অনুষ্ঠান করিনি—শুধু তার গৌরবমণ্ডিত রক্তমাখা দেহখানি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সমাহিত করেছি—দিল্লী যাওয়ার পথের এক নীরব প্রান্তে।

আর একদিন, একজন সিভিলিয়ান অফিসার—জেমস্—এমনিধারা শত্রুদের মাঝে শুধু তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিজের সৈন্যদের থেকে সে হঠাৎ এগিয়ে পড়লো। শত্রুরা সংখ্যায় ছিল বেশী। একটু দেরী হলেই হয়তো জেমস্ ধরা পড়তো অথবা মারা যেতো। কিন্তু ইন্দর সিং হাবিলদার সেদিনও 'ব্রেনগান' নিয়ে তার পাশে হাজির হয়। একা সে শত্রুদের মধ্যে গুলীবৃষ্টি করে তাদের পিছু হটিয়ে দেয়। আগে জেমস্‌কে সকলেই নিতান্ত নাবালক মনে করতো—তার কারণ, একে সে মাদ্রাজী সিভিলিয়ান, তার উপর নিতান্ত অল্পবয়স্ক। কিন্তু সেদিন সে যে বীরত্ব দেখিয়েছে, অনেক অভিজ্ঞ অফিসারের মধ্যেও তা বিরল। এমনিভাবে ছোট ছোট খণ্ডযুদ্ধ চলেছিল আমাদের দিকে।

আমাদের তিন নম্বর ব্যাটেলিয়ান এখান থেকে প্রায় বারো মাইল দূরে একটি পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সেখানে আমাদের একটি ছোট গার্ড পার্টির উপর হঠাৎ বৃটিশ পক্ষ থেকে আক্রমণ হয়। সেই পোস্টে আমাদের মাত্র ছ'জন লোক ছিল, আর আক্রমণকারীর সংখ্যা কম করে একটি কোম্পানী। আমাদের সৈন্যেরা বীরের মতো তাদের সঙ্গে লড়াই করে। পিছনে অন্যান্যেরা খবর পেয়ে তখনই তাদের সাহায্যের জন্য ছুটে আসে। তখন শত্রুরা বাধ্য হয়ে পিছু হটে। আমাদের পক্ষে কয়েকজন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়।

আহত হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের স্থান ছাড়েনি। যতক্ষণ পর্যন্ত সাহায্যকারী দল এসে না পেঁচেছে ততক্ষণ তারা আহত হয়েও বীরবিক্রমে লড়াই করেছে। আমাদের সৈন্যদের এই বাহাদুরি দেখে শত্রুরা আশ্চর্য হতো, আক্রমণ করতে বিশেষ ভয় পেতো। যখন আক্রমণ করতো তখন সংখ্যায় আমাদের চেয়ে প্রায় দশগুণ বেশী থাকতো।

প্যালেলের দিকে আমাদের গান্ধী রেজিমেণ্ট তখন বীরবিক্রমে যুদ্ধ করছে, এ খবর আমরা পেতাম। সেখানেও একদিন একটি কোম্পানীর উপর বৃটিশের একটি পুরো ব্যাটেলিয়ান আক্রমণ করে। দু'পক্ষে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ভয়ানক হাতাহাতি লড়াই হয়। সেদিন বৃটিশ পক্ষে হত ও আহত কমপক্ষে হয় প্রায় একশো। আমাদের পক্ষে মাত্র বারোজন আহত হয়। তাদের এই বীরত্বপূর্ণ কাহিনী শুনে আমাদের সৈন্যেরা খুব আনন্দিত হয়।

এমনিভাবে নানা অসুবিধার মধ্যেও আমরা শুধু অপেক্ষা করছি ইম্ফলের পতন। চৌধুরীর আবার ম্যালেরিয়া হয়, তাকে পিছনে হাসপাতালে যাওয়ার কথা বলি, কিন্তু সে রাজী হয় না। তার বাড়ি আসামের হাইলাকান্দি। ইম্ফল থেকে মাত্র একশো মাইল দূর। আমরা ইম্ফলের পতন সম্বন্ধে এতদূর নিশ্চিত ছিলাম যে, চৌধুরী কর্নেল গুলজারা সিং সাহেবকে বলেছিল, 'আমরা যখন এগিয়ে যাবো, তখন আমি বাড়ি যাওয়ার জন্য দশদিনের ছুটি চাই।' কর্নেল সাহেব হেসে বলেছিলেন, 'এত বড় আনন্দের কথা যে তোমাদের বাড়ির এলাকা সব চেয়ে আগে স্বাধীন হবে। তা তুমি শুধু একা বাড়ি যাবে কেন? আমরাও তোমার সাথী হবো।' আমরা রোজই আশা করতাম, আজ হয়তো কিছু খবর আসবে। মাঝে মাঝে গোপন খবর আসতো, বৃটিশরা ইম্ফল ত্যাগ করার জন্য তৈরী হচ্ছে, ইতিমধ্যে তাদের অনেক অফিসার বিমানে করে ইম্ফল থেকে চলে গেছে।

জুন মাসের মাঝামাঝি আমরা কলিকাতা থেকে একখানা চিঠি পাই। চিঠিখানা ইংরেজীতে লেখা ছিল, এবং নীচে কারো নাম সই করা ছিল না। ভাষাটা এইরূপ—"জয় হিন্দ হে ভারতের স্বাধীনতাকামী বীর সৈনিকগণ! আমরা জানি যে তোমরা ইম্ফলের কাছে, বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছ। ইতিপূর্বে তোমাদের ফৌজের কয়েকজন ধরা পড়ে এবং বৃটিশ তাদের চরম শাস্তি দিয়েছে। বৃটিশের হাতে ধরা পড়ার চাইতে আত্মহত্যাও শ্রেয়। আমরা প্রত্যেক দেশবাসী আজ তৈরী। আমরা শুধু আকুলভাবে ইম্ফলের পতনের অপেক্ষায় আছি। তোমরা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো।" চিঠিখানা একটি নাগা আমাদের কম্যাণ্ডার সাহেবের কাছে পেঁছে দেয়। সিপাহীদের চিঠিখানা পড়িয়ে শোনানো হয়।

আমাদের 'হেডকোয়ার্টারে' জাপানীদের একটি রেডিও সেট ছিল। আমি মাঝে মাঝে তাতে কলিকাতার খবর শুনতাম। তাতে ইম্ফল বা কোহিমার কোনও খবর থাকতো না। একদিন রাতে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝে মাঝে কানে শুধু ভেসে আসছে জাপানীদের বিরাট কামানের ধ্বনি। সারা পাহাড় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাতে; আমি কলিকাতার রেডিও শুনছি —"ছিঃ সরমা, এই তোমার পাতিব্রত্য!" হয়তো বেতারনাট্যকে দল তাদের অভিনয় শুরু করেছে। কোথায় শান্ত কলিকাতার বেতার অভিনয় আর কোথায় আমাদের রণভূমি। ঘন বর্ষার অন্ধকার রাতে কামানের গর্জনের মধ্যে কলিকাতার অভিনয় বড়ই বে-মানান মনে হচ্ছিল। উঠে চলে এলাম। গভীর অন্ধকার রাতে বর্ষার মধ্যে জাপানীরা আক্রমণ করতে বড় ভালবাসে। তাই কামানের গর্জন সেদিন হয় ভয়ংকর। বৃটিশ পক্ষ থেকে তার জবাব হয় আরও ভয়ংকর, জাপানীরা অযথা গোলাগুলী খরচ করে না। তারা ঠিকমতো আক্রমণ করে শত্রুদের ভালোমতো সন্ধান নিয়ে তবে কামান দাগে। আর বৃটিশ শত্রুপক্ষের একটি আওয়াজ শুনলে দশবার কামান দাগে, অযথা চারদিকে গোলা বৃষ্টি শুরু করে। এমন রাতে ঘুমের আশা ছাড়তে হয়। ছোট বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনে পড়ে এমন অনেক কথা, যা দিনের আলোকে একেবারেই থাকি ভুলে। মাঝে মাঝে আমাদের গার্ড-ও দু' একটি গুলী ছোড়ে। রাত্রির গভীর অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই সমস্ত আওয়াজ শুনে, আর রণভূমির প্রকৃত দৃশ্য দেখে বোঝা যায় যুদ্ধ কত ভয়ংকর!

এইভাবেই সারা জুন মাসটা কেটে গেল। জুলাই মাসের প্রথমেই খবর এল রেশন একেবারে শেষ। পিছন থেকে আসবার মোটেই সম্ভাবনা নেই। সমস্ত নদী ভেসে গেছে,

পথে লরী মোটেই চলতে পারছে না। কাজেই খাবারের বন্দোবস্ত নিজেদেরই করতে হবে। এই পাহাড়ে কিই-বা বন্দোবস্ত হতে পারে? যেটুকু বেঁচে ছিল অল্প কয়েকদিনেই তা শেষ হয়ে গেল। তখন শুরু হলো নাগাদের গ্রামে ধান খোঁজা! তাতে আর কদিন চলতে পারে। সামান্য কটি ভাত আর তার সঙ্গে যত কিছু আগাছা। একটি পাহাড়ে তখনও যথেষ্ট কচু ছিল, তাই সিদ্ধ করে খেতে শুরু করলাম। তার উপর জঙ্গলের ব্যাঙের ছাতা, জঙ্গলী কলার গাছ কিছুই বাদ যেতো না। অবস্থা প্রায় চরমে পৌঁছলো। তার উপর যা-তা আগাছা খেয়ে শুরু হলো আমাশয়। ঔষধ ছিল, কিন্তু এখানে এমন জায়গা ছিল না যাতে করে রুগীদের আলাদা করে রাখতে পারা যায়। কাজেই রোগীর সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে উঠতে লাগলো। লোকে যা-তা আগাছা খাওয়াতে মাঝে মাঝে বিষক্রিয়া শুরু হতে লাগলো। দু'একজন এত কষ্ট সহ্য না করতে পেরে আত্মহত্যা করলো।

আমার চাল ফুরিয়েছে, দিনকয়েক কচুর উপর চলছে, এমন সময় আজাদ হিন্দ দলের রোহিণী চৌধুরী বললে, 'কয়েকদিন আগে নীচের নালাতে এক জায়গায় কিছু ধান দেখেছি, চলো তাই নিয়ে আসি।' আমি ও রোহিণী বহু চড়াই ও উৎরাই ভেদ করে যখন নালায় পৌঁছলাম তখন দেখি আগেই নাগারা সে ধান সরিয়ে ফেলেছে। তবে তারা ধান নিয়ে যাবার সময় কিছু ধান মাটিতে পড়েছে আর বর্ষার জল পেয়ে তাতে অঙ্কুর গজিয়ে উঠেছে। আমরা দু'জনে তাই কুড়াতে লাগলাম। হঠাৎ রোহিণী হেসে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'হাসছ যে বড়?' সে বলল, 'মানুষ যে বলে অতি দুঃখেও হাসি পায়, আগে কথাটা ঠিক বুঝতে পারতাম না। এখন বুঝতে পারছি তাই হাসছি। আজ এমন দিন এসেছে যে, মাটিতে পড়ে থাকা অঙ্কুর বেরোনো ধান কুড়াচ্ছি দুটি ভাতের আশায়, অথচ জীবন যেভাবে কেটেছে তাতে স্বপ্নেও ভাবিনি যে,...।' দু'জনে কুড়িয়ে দশ-বারো সের ধান পেলাম। তাই নিয়ে ফিরে এলাম নিজেদের আশ্রয়ে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ, তাই এর পরিণতি হলো বড় করুণ! ধানগুলি ভিজে ছিল তাই আরদালীকে রাতে আগুন জেবলে সেগুলি শুকাতে বললাম। উদ্দেশ্য, রাতে শুকিয়ে পরদিন কুটে চাল বের করা হবে। আগুনে গরম করতে করতে হঠাৎ সেই ছোট্ট পাতার কুটীরে আগুন লেগে গেল। খড়ের ঘর, আগুন দাউ দাউ করে জবলে উঠলো। আগুন নেভাবার চেষ্টা করা হলো, কারণ কাছেই বাঁশঝাড়, যদি তাতে আগুন লাগে তবে সর্বনাশ! প্রায় আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন নেভানো সম্ভব হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাত খাওয়ার সাধও মিটলো আপাতত। ভাগ্যে না থাকলে সবই সম্ভব।

এমনিধারাই তখন আমাদের অবস্থা! সৈন্যেরা প্রায় 'মরিয়া' হয়ে উঠেছে! একে ম্যালেরিয়া আমাশয় প্রভৃতি রোগ, তার উপর খাদ্যাভাব! এর চাইতে তো শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ শতগুণে ভালো। আমাদের মধ্যে গরু ও শূকর খাওয়া একেবারে নিষেধ ছিল, কিন্তু অবস্থা এত গুরুতর হয়ে দাঁড়ালো যে, কর্নেল সাহেব হুকুম দিলেন—বর্তমান সমস্যায় খাদ্যাখাদ্য বিচার করলে চলবে না, সুতরাং নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী সকলেই সব কিছু খেতে পারে। তখন মুসলমানেরা কিছু জঙ্গলী গরু মেরেছে, হিন্দুরাও নাগাদের কাছ থেকে কয়েকটি শূকর কিনে খেয়েছে! এত কষ্টের মধ্যেও সকলের আশা, খুব শীঘ্রই হয়তো ইম্ফলের পতন হবে—আর আমাদের কষ্টের হবে লাঘব।

রাতে একদিন শুনলাম, রেডিওতে টোকিও থেকে খবর যে, জাপানীরা ইম্ফল থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে আছে। শুনে ভাবলাম হয়তো আর বেশী দেরী নেই। এদিককার নাগারা আমাদের অনেক খবর জানাতো। তারা বলতো ইম্ফলের ভিতর পর্যন্ত জাপানীরা ঢুকে পড়েছে! কিন্তু আশা যে কবে ফলবতী হবে তারই ছিল অপেক্ষা!

ডাঃ চৌধুরীর ক্যাম্পে আমি প্রায় রোজই বেড়াতে যেতাম। একদিন সেখানে গিয়েছি, বসে বসে গল্প করছি হঠাৎ ধপ্ ধপ্ করে কাছেই আওয়াজ হলো—কতকটা যেন হাত-বোমার মতো। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্পে সাড়া পড়ে গেল, তৈরীর হুকুম হলো, কিছু সৈন্য হাতিয়ার নিয়ে চারিদিকে ছোটাছুটি করলো। ব্যাপারটা তখন ঠিক বুঝতে না পারলেও পরে জানতে পারলাম যে, শত্রুদের কয়েকজন ক্যাম্পের একেবারে কাছাকাছি এসে গোটা

চারেক 'ট্রেঞ্চ মোরটার' ছুঁড়ে জঙ্গলের পথেই পালিয়ে গেছে। অবশ্য ভাগ্যক্রমে আমাদের কেউই সেদিন আহত হয়নি। সন্ধ্যার আগে চৌধুরী আমার সাথে আমার ক্যাম্পে এল। ফ্রণ্টে আসার পর এই তার প্রথম ক্যাম্প ছেড়ে বেরুনো। রাতে দু'জনে গল্প করছিলাম, হঠাৎ চৌধুরী বললে, 'একটা ব্যাপার শুনেছিস! আমাদের হয়তো শীঘ্রই পিছু হঠতে হবে!' আমি অবিশ্বাসের হাসি হাসলাম। কিন্তু চৌধুরী বললে, 'মোটেই হাসির কথা নয়,—একেবারে সত্য! এমনি ভাবে শুধু খাদ্যাভাব নয়, গোলাগুলীও আমাদের কম পড়ে গেছে অথচ পিছন থেকে কোনরূপ সাহায্য পাওয়া একেবারে অসম্ভব! অন্যান্য রেজিমেণ্টের উপর পিছু হঠার হুকুম জারি হয়ে গেছে—আমাদেরও শীগ্‌গিরই হবে!'

কথাটা শুনে মনে বড়ই দুঃখ হলো। এত দুঃখকষ্ট সহ্য করে, এতদূর এগিয়ে এসে আবার পিছু হঠা! এর চেয়ে যে মৃত্যুও ভালো! এখানে যারা দেহত্যাগ করেছে, তারাই আজ প্রকৃত শান্তি পেয়েছে। পিছনের নদী নালা সব ভেসে গেছে, সঙ্গে 'রেশন' মোটেই নেই! পথে শত বিপদ! আমাদের মহান্ কার্যের এ কী পরিণতি! ভারতবর্ষে পেঁছাব বলেই এতদূর এসেছি আর আজ ভারতের দ্বারে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে আবার ফিরে যেতে হবে! চিন্তায় চোখের ঘুম গেল, মনের আনন্দ দূর হলো।

॥ ৬ ॥

সুসংবাদ সর্বদা সত্য না হলেও দুঃখ-সংবাদ সত্য হয়ে থাকে! কাজেই আমাদের উপরে হুকুম হলো 'টামু' এবং সেখান থেকে পিছনে যাওয়ার জন্য। ২৪শে জুলাই তারিখে আমরা টামুর পথে যাত্রা করলাম। ভীষণ বৃষ্টি, পথ একেবারে পিচ্ছিল। তারপর বেশীর ভাগ পথই হচ্ছে উৎরাই। খানিকদূর আসার পর দেখি, ডাঃ প্রশারকর আসছে। পিঠে একটা বিরাট 'পিঠু', দু'হাতে দুটি 'হাঙ্গো', মাথায় লোহার টুপি। এক জায়গায় নামতে গিয়ে বেচারা পা পিছলে পড়ে যায়, তারপর যতই উঠবার চেষ্টা করে, ততই পা পিছলে পড়ে যায়। সেই ঘন পিচ্ছিল রাস্তায় বহুবার আছাড় খেয়ে কর্দমাক্ত দেহে ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করতে করতে আমরা পাহাড়ের নীচে নামতে লাগলাম।

সন্ধ্যার অল্প আগে—আমরা 'ইয়ংকোপি' এসে হাজির হলাম। এখানে ডাঃ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হলো। সারারাত আমরা তিনজনে এক সঙ্গেই কাটালাম। সকলের মুখেই এক কথা—এই ভাবে পিছু হঠবো! নানা পরামর্শ হলো সারা রাত। পরদিন সকালেই আমি ও ডাঃ চৌধুরী একসঙ্গে রওনা হলাম। প্রশারকর রয়ে গেল জেমসের অপেক্ষায়। বৃষ্টিতে পথে হাঁটুভর কাদা ও জল। সেই জল কাদা ভেঙ্গে অগ্রসর হওয়া বড়ই কষ্টকর। তার উপর সকাল থেকেই মাথার উপর প্লেনগুলি ঘোরাঘুরি করছে। অতি কষ্টে এক ঘণ্টায় মাত্র এক মাইল পথ চলতে সক্ষম হলাম। দুপুরে 'মিন্‌থা' এসে পেঁছলাম—মাত্র চার মাইল পথ। যত তাড়াতাড়ি যেতে পারা যায় ততই ভালো, কাজেই মিন্‌থাতে আমরা মোটেই অপেক্ষা না করে টামুর পথে পা বাড়ালাম। এখান থেকে চব্বিশ মাইল পথ—পথে গ্রাম প্রভৃতি কিছুই নেই। আমরা ঠিক করেছি সারাদিন যতটা পারি শুধু চলবো। রাতে বিশ্রাম করবো।

মিন্‌থা থেকে টামুর পথের দৃশ্য বড়ই করুণ। প্রতি দশ-বিশ হাত দূরে জাপানীদের মৃতদেহ। এরা হচ্ছে 'কোহিমা'-ফেরত দল। কতকগুলি অনেক আগেই মারা গেছে—তাদের মৃতদেহ পচে গেছে—পোকাতে শুধু কঙ্কালগুলি বাকি রেখেছে। কোথাও কোথাও তারা একেবারে সমাহিত—কোথাও কোথাও তারা বসে আছে শুধু মৃত্যুর অপেক্ষায়। প্রত্যেকেই 'ইউনিফরম' পরা—পূর্বদিকে মুখ করে শুয়ে আছে। তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একটি করুণ চাহনি! অথচ কোন রকম কাতরোক্তি নেই। রাস্তার দু'ধারে এমনি ধারা শত শত মৃত ও অর্ধমৃত দেহ! কতক জায়গাতে ভিজে রাস্তার উপর কম্বল বিছিয়ে গায়ে বর্ষাতি ঢেকে তারা শুয়ে আছে—মনে হচ্ছে যেন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে! আগে

ভাবলাম হয়তো মৃত, কিন্তু এগিয়ে দেখি শ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে, বেচারারা শুয়ে আছে—মৃত্যুর প্রতীক্ষায়! এই করুণ দৃশ্য দেখে যে কোনও মানুষের পক্ষে অশ্রু সংবরণ করা কঠিন, কিন্তু বিভীষিকাময় মৃত্যুর দৃশ্য দেখে দেখে আমাদের হৃদয়ও পাষাণে পরিণত হয়েছে। তবুও ব্যথাভরা অন্তরে জেগে ওঠে সহানুভূতি। দূর বিদেশে এমন ধারা অনশনে পলে পলে মৃত্যুবরণ অথচ তাতেও বীরত্ব ফুটে উঠেছে, কারণ তারা জানে এ মৃত্যু তাদের দেশের জন্য! তাই তো তারা বিশ্বাস করে, যুদ্ধে মৃত্যু হলে তারা পাবে দুর্লভ অমরলোকে দেবতার আসন! সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত হেঁটে প্রায় ন'দশ মাইল অতিক্রম করলাম। রাতের মতো কোথাও বিশ্রাম করতে হবে অথচ কোথাও এতটুকু শুকনো জায়গা নেই। যেখানে যা একটুকু শুকনো জায়গা আছে, সেখানেই কয়েকটি মৃতদেহ! যাই হোক, একটি জায়গা বেছে নিলাম ছোট একটি নালার কাছে। যে ছোট ছোট দুটি বর্ষাতি ছিল আমাদের সঙ্গে, তাই টাঙিয়ে নামমাত্র তাঁবু করলাম। নীচে কিছু লম্বা ঘাস বিছিয়ে তার উপর বিছালাম—আমাদের আধ ভেজা কম্বল! সঙ্গে অল্প যা চাল ছিল তাই সিদ্ধ করে খেয়ে ঘুমের ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলাম।

মশার অত্যাচার খুব বেশী। তার উপর ছোট ছোট কালো মশার মতো পোকা, নাম 'পিশু'—এর অত্যাচার একেবারেই অসহনীয়। এদের কামড়ে সারা গা জ্বালিয়ে দেয়, এমন কি মাথার চুলের মধ্যে পর্যন্ত তাদের প্রবেশাধিকার! তার উপরে আশপাশ থেকে মৃতদেহ পচার দুর্গন্ধ ভেসে আসছে। কোনও রকমে সেই অবস্থাতেই সারারাত কাটিয়ে সকালে একটু চা-পাতা সিদ্ধ খেয়ে আবার চলতে শুরু করলাম। আমাদের সৈন্যরা সকলেই ছোট ছোট দলবদ্ধ হয়ে চলেছে—পথে অনেকে এগিয়ে যাচ্ছে—আবার পিছিয়ে পড়ছে। শরীর একেবারে অবসন্ন, তার উপরে, যা কিছু মালপত্র সবই পিঠের উপর। অল্প কিছুদূর যাই আবার বিশ্রাম করি, এইভাবে চলতে লাগলাম। আশা ছিল সন্ধ্যার আগেই নদীর ধারে 'মোরে'-তে পেঁছাতে পারবো। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভবপর হয়ে উঠলো না। আজও রাতে গতকালের মতো পথের ধারে তেমনি ভাবে রাত কাটালাম। একেবারে ভোরে উঠে আবার চলতে শুরু করলাম। 'মোরের' কাছাকাছি একটি পার্বত্য নদী, ভীষণ বেগে তার স্রোত বয়ে চলেছে। আমাদের আগে যারা পার হয়েছে তারা একটি মোটা দড়ি বেঁধেছে নদীর দুই তীরে। সেই দড়ি ধরে পার হওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। নদীতে নামলাম। মাত্র কোমর জল। কিন্তু নদীর স্রোত একেবারে টেনে নিয়ে যায়। বহু কষ্টে দড়ি ধরে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম। তাতেও মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এবার হয়তো আর দড়ি ধরে থাকতে সমর্থ হবো না, একেবারে ভেসে যেতে হবে! যাই হোক, আস্তে আস্তে আমরা সকলেই নদী পার হয়ে তীরে এলাম।

॥ ৭ ॥

সকাল প্রায় দশটার সময় নদীর ধারে 'মোরে'-তে হাজির হলাম। এখানে পূর্বপরিচিত মল্লিকদার সঙ্গে দেখা হলো। আমাদের অবস্থা দেখে তো চিনতেই পারে না! মাথায় কতদিন তেল পড়েনি! সেফটি রেজর থাকা সত্ত্বেও দাড়িগোঁফ কামানো হয়নি—ভিজে ময়লা কাপড়-জামা। যাই হোক, মল্লিকদা অনেকদিন এখানে আছে—কাজেই তার সবকিছুর বন্দোবস্ত ছিল। আমাদের মাথা গোঁজবার মতো একটু জায়গা দিলে। খানিকটা চা-পাতা সিদ্ধ জল খাওয়ার পর শরীরে যেন একটু জোর পেলাম। মল্লিকদার ঘরের কাছাকাছি একটি ট্রেঞ্চের উপর একজন লোক বসে আছে দেখলাম, আমাদেরই মতো খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। মল্লিকদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'একে তো চিনলাম না, যদিও মুখটি দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।' শুনলাম আমাদেরই ডিভিসন কম্যাণ্ডার কর্নেল কিয়ানী। কাছে গিয়ে 'স্যালুট' করতেই চিনতে পারলেন আমাদের, তারপর কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্প হলো। সকলেই পিছু হটার জন্য দুঃখিত অথচ উপায়ও অন্য কিছু নেই। আগে কর্নেল কিয়ানীকে

যেমন দেখেছিলাম, বর্তমান চেহারার সঙ্গে তার কত পার্থক্য—মোটে চেনা যায় না। এখানে দেখলাম, ওপারে 'টামু' যাওয়া অসম্ভব। নদীর উপর পুল ছিল তা ভেসে গেছে। একদিকে জাপানীরা ও অন্য দিকে আমাদের ইন্‌জিনিয়ারিং কোম্পানী নৌকাতে নদী পার করার চেষ্টা করছে, কিন্তু ভীষণ স্রোত—নৌকা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার খাটিয়ে দড়ি বেঁধে কোনরূপে একটা কিছু করার আপ্রাণ চেষ্টা চলেছে! কাজেই আমাদের যে এখানে দু'একদিন অপেক্ষা করতে হবে তা সহজেই বুঝতে পারলাম। এখানে একটি খুব বড় ডুমুর গাছ আছে, তাতে অনেক ডুমুর ফলেছিল। মল্লিকদা কিছু চাল আগে থেকেই সংগ্রহ করেছিল—কিছু ভাত ও একথালা ডুমুরসিদ্ধ যেন আমাদের কাছে রাজভোগ বলেই মনে হলো। রাতে শুয়ে শুয়ে অনেক কিছু খবর শোনা গেল—যা আমরা মোটেই জানতাম না। কিছুদিন আগে মল্লিকদা এখানে একটি পরিত্যক্ত ট্রেঞ্চে একটি আমেরিকান ম্যাগাজিন পায়, তাতে নেতাজীর সম্বন্ধে কিছু লেখা ছিল। ভাষাটা ঠিক মনে না পড়লেও কতকটা এইরূপঃ—

"Two Boses not related to one another, one Rash Behari and other Subhas Chandra have formed a government of their own. Under this government they have trained a large number of Indians and formed an army, which is known as Indian National Army. Their government has been recognised by the Axis powers. Indian Government should keep an eye on this movement."

তাতে নেতাজীর একটি পুরাতন ফটোও ছিল। মল্লিকদা এই ম্যাগাজিনটি নেতাজীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাজেই মনে হয়, বৃটিশ তরফ থেকে যতই নেতাজীকে 'puppet' বলা হোক, ভিতরে ভিতরে তারা সব কিছুই জানতো আর ভয়ও পেতো। বৃটিশ, আমেরিকান বা ভারতবাসী প্রত্যেকেই বেশ ভালো ভাবে জানতো যে, সুভাষ বসুর মতো লোক কখনো 'দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্ব' আনতে পারেন না। যে দেশসেবকের সারা জীবন কেটেছে কারান্তরালে শুধু দেশসেবার জন্য, যিনি শুধু দেশের স্বাধীনতার জন্য নানা দুঃখকষ্ট সহ্য করে দেশ থেকে চলে এসেছেন নিজের জীবন বিপন্ন করে—তাঁকে অতি বড় শত্রুও puppet আখ্যা দিতে পারে না। কিন্তু বৃটিশ প্রোপাগান্ডার কাছে প্রত্যেকটি সত্যকে পরাজয় মানতে হয়। কাজেই এতে নূতনত্ব কিছুই নেই! পরাধীন দেশের নেতার পক্ষে এই হচ্ছে বিদেশীর প্রশংসাপত্র।

আর একটি ঘটনা শুনলাম। কিছুদিন আগে কর্নেল চ্যাটার্জি এই পথে এসেছিলেন। এখান থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে 'চামলে' তখন আমাদের ডিভিসন হেড কোয়ার্টার। তিনি টামু পার হয়ে যখন আসামে পদার্পণ করেন, তখন নিজ শুভ্র উপবীত গ্রহণ করে মাটিতে লুটিয়ে ভারতমাতাকে বন্দনা করেন। সে দৃশ্য যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরা কেউ অশ্রুরোধ করতে পারেননি। সেদিন তাঁর হৃদয়াবেগ প্রত্যেককেই অভিভূত করেছিল। তিনি 'চামলে' পেঁছানর পর সেখানে কয়েকজন ভারতীয় ও জাপানী উচ্চপদস্থ অফিসার ফটো তোলার বন্দোবস্ত করেন। প্রত্যেকেই ফটো তোলার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছেন এমন সময় কাছাকাছি একটি জায়গাতে বৃটিশের একটি 'সেল' এসে ফেটে যায়। সেলের একটি টুকরো কর্নেল চ্যাটার্জির কোমরের পাশ দিয়ে কাপড় জামা কেটে বেরিয়ে যায়। পরে অবশ্য দেখা যায়, তিনি বিশেষ কিছু আঘাত পাননি। চামড়ার উপর ঘেঁষেই সেলের টুকরো চলে গেছে।

আরও একটি ঘটনার কথা যা এখানে শুনলাম তা জানাচ্ছি। এতে বেশ ভালোভাবেই জানতে পারা যাবে, 'আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের' কতটা ক্ষমতা ছিল। এখানকার একটি 'আজাদ হিন্দ দল' জাপানীদের জানায়, যেহেতু 'মোরে' থেকে ভারতবর্ষ শুরু হয়েছে সেই হেতু এখান থেকেই আমাদের রাজ্য শুরু হচ্ছে। এখানকার যা কিছু জিনিসপত্র আছে সবই আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের। আর সেইজন্য এই দল সব কিছু জিনিস সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে। কিন্তু জাপানীরা বলে যে, ইম্ফলের এখনও পতন হয়নি, ইম্ফলের পর থেকেই তোমাদের কাজ শুরু হবে, তার আগে নয়; এই নিয়ে দুইপক্ষেই কিছুদিন একটু

গোলযোগ চলে। পরে জাপানীদের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী তার মীমাংসা করে দেন। তাঁরা বলেন. যেহেতু, 'মোরে' থেকে ভারতবর্ষ শুরু সেই হেতু এখান থেকেই 'আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট' তাঁদের কাজ শুরু করবার অধিকারী।' যে জাপানীরা এতে বাধা দিয়েছে তারা অন্যায় করেছে। জাপানের প্রধান মন্ত্রী তোজো বার বার বলেছেন,—"An inch of land occupied either by Nippon or by I. N. A. on India, will be controlled by the Provisional Government of Free INDIA."

কাজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সহজেই মীমাংসিত হয়ে যায়, আর 'আজাদ হিন্দ দল' এখানকার বৃটিশ পরিত্যক্ত সব কিছু জিনিস অধিকার করে।

দ্বিতীয় রাতেই তার খাটিয়ে ও দড়ি বেঁধে জাপানীরা নৌকা দ্বারা নদী পার হওয়ার বন্দোবস্ত করে। আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী তৃতীয় রাতে লোক পার হবার মতো একটি পুলের বন্দোবস্ত করে। কাজেই আমাদের বাধ্য হয়ে এখানে দু'দিন থাকতে হয়। আমাদের তাড়াতাড়ি পার হওয়া দরকার, কারণ শোনা গেল, এখান থেকে মাত্র দশ মাইল দূরে সিবনে বৃটিশ কিছু 'প্যারাট্রুপ' নামিয়েছিল, তবে জাপানীরা তাদের একেবারে নির্মূল করেছে। দু'দিন এখানে বেশ আরামেই কাটানো গেল। মল্লিকদার আছে ছাদ দেওয়া ঘর আর ভাতের সঙ্গে প্রচুর ডুমুর সিদ্ধ। এখান থেকে দু'দিনের মতো চাউল সংগ্রহ করে আমরা রাতে নদী পার হয়ে টামু পেঁৗছলাম। শুনলাম আমাদের সৈন্যরা পার হয়ে এলেই এখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীও শীঘ্র চলে আসবে। রাত প্রায় বারোটায় আমরা 'টামু' পেঁৗছলাম। একে অন্ধকার রাত, তার উপর বেশ জোরেই বৃষ্টি শুরু হলো। রাতটা টামুতেই কাটাতে হবে, অথচ মাথা গোঁজবার মতো জায়গার অভাব। আগে যে বাংলোগুলিতে থাকতাম, সেগুলি বোমাবর্ষণে প্রায় সবই ভেঙ্গে গেছে। তবু তারই তলায় কোন রকমে রাত কাটাবার ইচ্ছায় সেখানে উপস্থিত হলাম। একটি বাংলোর একেবারে নীচে আমাদের আরদালী বর্ষাতি বিছিয়ে বিছানা পাতবার যোগাড় করছিল। অন্ধকারে কারও গায়ে হাত লাগতেই সে 'কৌন হ্যায়' বলে উঠল। পরে জবাব না পেয়ে আমাদের আলো জ্বালাতে বলে। ছোট্ট একটি মোমবাতি ও আধখানা দিয়াশলাই আমাদের কাছে ছিল। আলো জ্বালতেই দেখি সেখানে পড়ে রয়েছে একটি জাপানীর মৃতদেহ। কয়েকদিন আগেকার মৃত্যু, কাজেই মৃতদেহ একেবারে ফুলে উঠেছে। তাড়াতাড়ি এখান থেকে পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হলাম। পরে অন্যান্য ভাঙা বাংলোতে অনুসন্ধান করে জানলাম, সর্বত্রই অবস্থা একই রকম। তখন বাধ্য হয়ে স্থির করলাম এর চেয়ে গাছতলাই ভালো। বড় কোনও গাছ পাওয়া গেল না, কাজেই একটি ছোট গাছের নীচে 'পীঠু' রেখে গায়ে বর্ষাতি জড়িয়ে তার উপরেই বসে পড়লাম। নীচে জল, উপর থেকেও জল, তার উপর গায়ের কাপড় জামা সবই ভিজে, কাজেই অবস্থা মোটেই সুবিধার নয়। বৃষ্টি থামার পর একটু আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কাঠ সবই ভিজে, আগুন জ্বললো না। তখন অন্ধকারে চুপচাপ বসে বসেই সারারাত কাটাতে হলো।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কোয়ার্টার মাস্টারের খোঁজ করলাম। শুনেছিলাম, তিনি এখানেই আছেন কিন্তু জায়গা পরিবর্তন করেছিলেন বলে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাঁর সন্ধান পেলাম না। তখন আর বেশী দেরী করা উচিত হবে না ভেবে সোজা কালেওয়ার রাস্তা ধরলাম। দিনের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ বিমানগুলি ঘোরাফেরা শুরু করলো একেবারে নীচু দিয়ে। কিছুদূর চলি, আবার বিমানের শব্দে গাছতলায় আত্মগোপন করি. আবার চলি। প্রত্যেকেই খুব অসুস্থ বোধ করছি। মনে হচ্ছে এমনিভাবে আর বেশিদূর যেতে পারবো না। তারপর পথের ধারে অসংখ্য মৃতদেহ দেখে মনের আশা ভরসা সব কিছুই মাটিতে মিশে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাদেরও হয়তো এমনি ভাবে পথের ধারে চির নিদ্রায় নিদ্রিত হতে হবে। মৃত্যুতে দুঃখ নেই, কিন্তু এমনি ভাবে সহায়-সম্বলহীন হয়ে পলে পলে মৃত্যুবরণ—এ-যে অসম্ভব। মাঝে মাঝে টোটাভরা পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে ভাবতাম—হয়তো এরই সাহায্য একদিন নিতে হবে। চৌধুরী বলতো, 'এতটা সাহস আমার নেই—তাই সঙ্গে করে রেখেছি যথেষ্ট 'মরফিয়া'। যদি

জীবনে এমন দিন একান্তই আসে, তখন ব্যবহার করা যাবে।'

এমনি তখন মনের অবস্থা, তবু প্রাণের ক্ষীণ আশা নিয়ে চলেছি যদি কোন নিরাপদ আশ্রয়ে পেঁছিতে পারি। মানুষ আশা নিয়ে বেঁচে থাকে। আমরাও আজ তাই বেঁচে আছি। নিজেদের যা' চেহারা হয়েছে দেখলে মন হয় শ্মশান থেকে বুঝি-বা কোনও প্রেতাত্মা উঠে এল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, পরনে ময়লা সার্ট ও প্যাণ্ট—চোখ বসে গেছে। একে অপরের দিকে তাকাই—প্রাণের ভেতরটা কেঁপে উঠলেও বাইরে সাহস সঞ্চয় করে হাসি আর ভাবি, কতদিনে অবসান হবে এই কষ্টের। এর শেষই বা কোথায়?

চলতে হবে তাই চলেছি; সবাই চলেছে আমরাও চলেছি। বেলা প্রায় একটার সময় এসে হাজির হলাম 'পন্থা' নামে একটি গ্রামে। গ্রাম আগে ছিল, বর্তমানে আছে মাত্র কয়েকটি ভাঙ্গা কুটির। আজকে আর বেশী পথ চলা একেবারেই অসম্ভব, কাজেই দিনটা ও রাতটা এখানেই কাটাবো স্থির করলাম। পরিত্যক্ত গ্রামের ভিতর প্রবেশ করলাম। কুটীর বেশীর ভাগই ভেঙ্গে গেছে। এর মধ্যে দু'একটা যা মাথা তুলে আছে সেগুলি আগে থেকেই অধিকার করেছে আমাদের ও জাপানীদের পীড়িত সৈন্যরা। যেখানে যারা রয়েছে তাদের আশেপাশে রয়েছে অনেক মৃতদেহ। নিতান্ত অসহায় অবস্থায় খাদ্যাভাবে ঔষধের অভাবে এরা পলে পলে মৃত্যুবরণ করেছে দেশের জন্য। এদের এই চরম আত্মদান কি বৃথা হতে পারে? বর্মার অজ্ঞাত অখ্যাত পল্লীতে পথের প্রান্তে যে শহীদরা তাদের জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দান করেছে দেশমাতৃকার পূজার বেদীতলে, সেই রক্তের মূল্য একদিন নিশ্চয়ই দেশবাসী আদায় করবে তাদেরই কাছ থেকে, যারা এদের মৃত্যুর জন্য দায়ী। এই সকল বীরের নাম চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে ভারতবাসীর হৃদয়ে। 'মিন্থা' থেকে টাঙ্গুর পথে দেখেছি শুধু জাপানীদের মৃতদেহ। এখান থেকে শুরু হয়েছে আমাদের। একটি ভাঙ্গা কুটীরে আমরাও আশ্রয় নিলাম। এবার রান্নার বন্দোবস্ত করতে হবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পেলাম কয়েকটি কুমড়া গাছ। তারই কিছু ডাঁটা ও শাক তুলে নিয়ে এলাম। সঙ্গে ছিল অল্প চাল। তাই আজকের খাওয়াটা একেবারে মন্দ হলো না। কিন্তু আজ আমাদের চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখলাম জীবনে তা কোনদিন ভুলতে পারব না। আমাদের সামনেই একটি ভাঙ্গা কুটীরে কয়েকজন রুগ্ন জাপানী আশ্রয় নিয়েছিল। তাদেরও কিছু খাবার ছিল না। কিছুদূরে একটি মরা কুকুর পড়ে ছিল। কতদিনের তা বলা যায় না। জাপানীরা সেই কুকুরটিকে কেটে ছাল ছাড়িয়ে তার মাংস টুকরো টুকরো করলো। তারপর কুড়িয়ে আনলো একটি ভাঙ্গা টিনের টুকুরো। একটু উনুন মতো করে কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালালো। তারপর সেই মাংস টিনের উপর রেখে সেঁকতে শুরু করলে। একটি কঞ্চি এনে তা দিয়ে তৈরি হলো 'চপ স্টিক' (chop stick)। তারপর শুরু হলো তাদের খাওয়া। পাঁচ ছ'জন এক জায়গায় জড়ো হয়ে পরম আনন্দ সহকারে সেই আধপোড়া কুকুরের মাংস খেতে লাগলো। বেশীক্ষণ এ দৃশ্য দেখতে পারলাম না। অবস্থা আজ প্রায় সমপর্যায়ে। কাজেই এদের অবস্থা আজ পূর্ণভাবে অনুভব করতে পারি। ক্ষুধা পেলে মানুষ কি না খেতে পারে? বাঁচবার জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে। মনে পড়ে গেল ছেলেবেলাতে গল্প পড়েছিলাম, কোনও এক লর্ডের ছেলে যুদ্ধে কয়েকদিন খেতে পায়নি। কয়েকজন সৈনিক কয়েকদিনের শুকনো এক টুকরো রুটি 'ডাস্টবিনে' ফেলে দিয়েছিল। আর সেই লর্ডের ছেলে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে সেই রুটির টুকরো খেয়েছিল। সেদিন মনে হয়েছিল এ শুধু গল্প, এর মধ্যে সত্যতা থাকতে পারে না। কিন্তু আজ বুঝেছি মানুষের ক্ষুধার জ্বালা কি তীব্র। তাই তো লড়াইয়ে ঘোড়া, গরু, গাধা কোন কিছুরই মাংস বাদ যায় না—অবস্থার ফেরে।

এখান থেকে কিছু দূরে শুনলাম দু'একটা গ্রাম আছে। দুপুরে খাওয়ার পর আরদালীকে পাঠালাম, যদি কিছু চালের যোগাড় করতে পারে। খানিক পরে ঘুরে এসে জানালে, পয়সা দিয়ে কোন কিছু পাওয়া সম্ভব নয়, তবে কাপড় জামা থাকলে তার পরিবর্তে কিছু চাল পাওয়া যেতে পারে। নিজেদের পুরাতন জামা দিয়ে পাঠালাম। একটি ছিটের সার্টের পরিবর্তে এল মাত্র এক পাউন্ড চাল। যাই হোক, প্রাণ বাঁচলে সব কিছুই হবে, এই আশাতে আমরা প্রায় চার পাউন্ড চাল যোগাড় করলাম। দিন দুয়েকের জন্য এবার নিশ্চিন্ত হওয়া

গেল। সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে আশা এল—এবার পথের পাশে মাঝে মাঝে গ্রাম পড়বে আর চেষ্টা করলে কিছু চাল পাওয়া অসম্ভব হবে না।

পরের দিন সকালে উঠেই চলতে লাগলাম। এবার রাস্তা অনেকটা ভালো। সন্ধ্যার অল্প আগে একটি ছোট্ট পল্লীতে আশ্রয় নিলাম। পরদিন পেঁছিলাম ওয়াটক্। এখানে পেঁছে প্রথমে কোথাও জায়গা পেলাম না। রাস্তার ধারে যা দু'একটা ভাংগা মন্দির আছে, সেখানে পড়ে আছে মৃতদেহ। কাজেই একেবারে ভিতরের দিকে গ্রামের মাঝে আশ্রয় খুঁজে এলাম। এখানে আমাদের পূর্ব পরিচিত কয়েকজন আজাদ হিন্দ দলের লোকের দেখা পেলাম। তার মধ্যে রোহিণী চৌধুরী, নাহা, আর সেনগুপ্ত, এই তিনজন বাঙালী ও আর দুইজন ইউ. পি'র লোক। এ দলটি এবার আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে। আগে আমরা ছিলাম চারজন, এবার হলাম নয়জন। তার উপর সুবিধা হচ্ছে, চৌধুরী বেশ সুন্দর বর্মী ভাষা বলতে পারে, কাজেই নানা কাজে তার অনেক সাহায্য পাওয়া যাবে। এ গ্রামে কিছু ধান পাওয়া গিয়েছিল, তাই কুটে চাল তৈরী করে নিলাম। কাছেই একটি বড় নদী। শুনলাম তাতে এত বেশী জল যে, পার হওয়া অসম্ভব। ভাবলাম দু'একদিন গ্রামেই থাকবো, তারপর সুবিধা-সুযোগ দেখা যাবে। কিন্তু পরদিন সকালে দেখি নদীর একটি জায়গা দিয়ে কতক জাপানী পার হচ্ছে। আমরাও তৈরী হলাম। এক জায়গাতে প্রায় বুক-জল। সকলে সেখান দিয়ে পার হচ্ছে। স্রোত এত বেশী যে, আড়াআড়ি পার হতে গেলেও অনেক দূর পর্যন্ত নীচের দিকে নেমে যেতে হয়। সকলে যে ভাবে পার হচ্ছে আমিও সেইভাবে তৈরী হলাম, অর্থাৎ বুট, পট্টি ও প্যান্ট খুলে শুধু একটি মাত্র 'আন্ডারওয়ার' ও সার্ট গায়ে রইলো। আর যা কিছু জিনিস ছিল সব কিছু 'পিঠু'টার মধ্যে ভর্তি করে তা মাথার উপর চাপালাম। সাঁতার একেবারেই জানি না, কাজেই বেশ ভয় করছিল। যাই হোক, সকলে পার হচ্ছে, আমরাও তাদের সঙ্গে জলে নামলাম। মাথায় বোঝা নেওয়া একেবারেই অভ্যাসের বাইরে, কাজেই 'পিঠু' জলে পড়ে গেল। ধরবার চেষ্টা করতেই স্রোতের মাঝে আর পা রাখতে পারলাম না। কোন রকমে ডুবে মরার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ওপারে উঠলাম। কিন্তু জিনিসপত্র সবই ভেসে গেল। অন্যান্য জিনিসের জন্য বিশেষ দুঃখিত হইনি, তবে আমার ডাইরী ও পিস্তলটা যাওয়াতে বিশেষ দুঃখিত হলাম। যাক, কোনক্রমে প্রাণ তো বেঁচে গেল। এবার আর সঙ্গে ভারী জিনিস কিছুই নেই। চৌধুরীর কাছে একটি প্যান্ট ছিল, পরলাম।

খানিক দূর চলার পর বুটের অভাব বেশ ভালো করেই অনুভব করলাম। পথে অসম্ভব কাদা। কোথাও হাঁটু-জল। কাদায় পা রাখা মুস্কিল হয়ে দাঁড়ালো। এইভাবে খানিকদূরে যাওয়ার পর একটি গ্রামে এলাম। এবারও একটি ছোট নদী পার হতে হবে। এই গ্রামে আসার পর দেখলাম আমাদের কয়েকজন অফিসার ও সিপাহী এখানে জমা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে এ পথে এই নদীর পর আরও একটি খুব বড় নদী পার হতে হবে। সে নদীতে এত বেশী স্রোত যে, একমাত্র হাতী ছাড়া সে নদী পার হওয়া অসম্ভব। এখানে গান্ধী রেজিমেন্টের ডাক্তার মেজর শাহ ও মেজর হাসানের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁরাও এখানে আটক হয়ে পড়েছেন। শাহর কাছে শুনলাম ডাঃ বীরেন রায় ও কানাই দাস আগেই নদী পার হয়ে গেছে। মেজর হাসানের সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল না, শুধু নামই শুনেছিলাম। তিনি বার্লিন থেকে নেতাজীর সঙ্গে আসেন এবং রেজিমেন্টের আসার আগে তিনি কিছুদিন নেতাজীর সঙ্গে সঙ্গেই থাকতেন, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী হিসাবে। তাঁর সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেয়ে ও তাঁর ব্যবহারে আমি খুবই আনন্দ পেয়েছি। এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও তাঁকে সর্বদা হাসতে দেখেছি। কাপড়, জামা তাঁরও কিছু ছিল না, যা পরেছিলেন, শুধু তাই। পা এক জায়গাতে কেটে যাওয়াতে খালি পায়েই হাঁটতে হচ্ছিল। আমরা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন—'সামনের নদী পার হয়ে আমরা সোজা পথে না গিয়ে চিন্দুইন নদীর ধার ধরে ধরে কলেওয়ার পথে চলবো।' কাছে যে ছোট নদীটা ছিল তাতেও প্রায় আগের নদীর মতোই জল। কাজেই এবার একটু তৈরী হয়েই নদীতে নামলাম। রোহিণী চৌধুরী ও আমার আরদালী দিলওয়ারা সিং খুব ভালো সাঁতার জানতো। তাদের আগে নদী পার করিয়ে ওপারে একটু নীচের দিকে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে

থাকতে বললাম। আমার কাছে কোন বোঝা-ই ছিল না, কাজেই ডাঃ চৌধুরীর জিনিসপত্র আমরা আধাআধি করে ভাগ করে নিলাম। তারপর বিশেষ সতর্কভাবে জলে নামলাম। কিন্তু অবস্থা সেদিনকার মতো একই হলো। খানিক পরেই আর ভার রাখতে পারলাম না। তখন রোহিণী আমাকে জিনিসপত্র ছেড়ে দিয়ে ডানদিকে সাঁতার কাটতে বললো। আমি সেভাবে চলার চেষ্টা করে বেশ খানিকটা জল খেয়ে কোনও রকমে দিলওয়ারার সাহায্যে তীরে উঠলাম। আমার কাছ থেকে পিঠুটা জলে ভেসে গিয়েছিল, রোহিণী তা উদ্ধার করলো। আজকের দিনে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকজন জলে ভেসে গেল। তাদের বাঁচাবার কোন উপায় ছিল না। এবার নদী পার হওয়ার পর আমরা একটি বিরাট দলে পরিণত হলাম—আট দশজন অফিসার ও প্রায় দেড়শো সিপাহী।

এতবড় একটি দল, একসঙ্গে পথ চলা নিরাপদ নয়, তাই আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মেজর হাসানের সঙ্গে চলতে লাগলাম। একটি ম্যাপ তাঁর সঙ্গে ছিল—আমরা সেইটি দেখে তদনুযায়ী পথ চলছিলাম। প্রথম দিন এমনিভাবে সারাদিন চলার পর একস্থানে উপস্থিত হলাম। সেখানে আগে একটি গ্রাম ছিল। কিন্তু বর্তমানে অর্ধদগ্ধ কয়েকটি কাঠের খুটি ছাড়া গ্রামের আর কোন চিহ্ন নেই। রাতে এখানেই থাকতে হবে, কাজেই কয়েকটি পোড়া টিন সংগ্রহ করে একটু ছাদের মতো তৈরী করলাম। তার ভিতরে আমাদের ভিজে কম্বল বিছিয়ে নামেমাত্র বিছানা তৈরী হলো। ছোট ছোট 'পিশু'র কামড় অসহ্য হলো। বহু খোঁজাখুঁজির পর একটু কাঠ যোগাড় করে আগুন জ্বালানোর পর ধোঁয়াতে 'পিশু'র অত্যাচার একটু কমলো। এই গ্রামেও কিছু কিছু শাকসবজির গাছ ছিল—তাই সিদ্ধ করে ভাত খাওয়া হলো। রাতে সেই ভিজে জামা কাপড় পরে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু মশার কামড়, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষুদে পোকা 'পিশু'। গায়ে দেবার মতো কিছু নেই। চৌধুরীর ভিজে মশারিটা দিয়ে বেশ করে আপাদমস্তক মুড়ে শুয়ে পড়লাম। ক্লান্তি যথেষ্ট, তাই নিদ্রা এল। শরীরের নাম মহাশয় যা সহাবে তাই সয়—এই প্রবাদ বাক্যটি যে কতখানি সত্য তা বেশ ভালো করেই আজ বুঝতে পারছি। পাঁচ মাইল হাঁটার পর যখন মনে হচ্ছে আর এক-পা এগুনো সম্ভব নয়, তখন এই শরীরটাকে মনের আদেশে আরো দশটি মাইল টেনে নিয়ে গেছি। সামান্য একটু ভিজে জামা গায়ে দিলে ভয় হতো জ্বর হবে, হয়তো বা নিউমোনিয়া হবে, কিন্তু এখন প্রতিদিন শুধু জলের মধ্যে থেকে দিনরাত ভিজে জামা-কাপড় ব্যবহার করেও দেখি, শরীরে সব সহ্য হয়।

পরদিন সকালে উঠে আবার যাত্রা। এবার অবশ্য সন্ধ্যার আগে একটি ছোটখাটো গ্রামে আশ্রয় পেলাম। এ গ্রামে লোকজন আছে। আমরা একটি খালি বাড়িতে আশ্রয় নিলাম, আর আমাদের লোকেরা বর্মীদের বাড়ির নীচে কোনও রকমে রাত কাটালো। চা-পাতা সঙ্গে ছিল কিন্তু এতদিন চিনি বা গুড় কিছুই ছিল না, এবার গ্রাম থেকে কিছু গুড় সংগ্রহ করলাম। আর সংগ্রহ করলাম কিছু বর্মী 'সিলে' অর্থাৎ সিগার। ধূম-পানটা কিছুদিন বাধ্য হয়েই বন্ধ রাখতে হয়েছিল, এবার সুযোগ পাওয়াতে ইচ্ছাটা খুবই বলবতী হয়ে উঠলো।

রাতটা গ্রামে কাটিয়ে আবার ভোর বেলাতে চলতে শুরু করলাম। এবার আমাদের পেঁছতে হবে মোলায়েক। আজ সেখানে পেঁছান সম্ভব নয়—তাই, দিনে খানিকটা বিশ্রাম করা গেল। ইচ্ছা, রাতে হাঁটা। গ্রাম থেকে 'গাইড' নিয়ে চলতে লাগলাম। আমাদের মধ্যে অনেকে অসুস্থ ছিল, তাদের পক্ষে এইভাবে পথ চলা একেবারে অসম্ভব। তবু মেজর হাসান ঠিক গরু তাড়ানোর মতো করেই সঙ্গে নিয়ে চললেন, কারণ পথের ধারে একা যে পড়ে থাকবে মৃত্যু তার নিশ্চিত। তাই কষ্ট সহ্য করেও কোন রকমে যদি তারা পেঁছাতে পারে কালেওয়ার তবে তাদের জন্য সবকিছু ব্যবস্থা হতে পারবে। এমনিভাবে সকলকে নিয়ে যাওয়াও বড় সোজা কথা নয়, বিশেষ করে সঙ্গে কয়েকজন আমাশয়ের রুগী। খানিকটা চলে আবার বসে পড়ে। আবার তাদের তাড়া দিয়ে বা মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে সঙ্গে করে নেওয়া। চলতে চলতে ভোরের একটু আগে মোলায়েকের কাছে এসে পেঁছলাম। এত লোক একসঙ্গে শহরে থাকা নিরাপদ নয়, কাজেই শহর থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে

একটি ছোট জঙ্গলে আশ্রয় নিলাম।

আগে এখানে একটি ছোট শহর ছিল। এখনও অনেক সুন্দর সুন্দর বড় বড় বাড়ি চারিদিকে পড়ে রয়েছে। ফুটবলের মাঠ, স্কুলের বাড়ি, সব কিছুই দাঁড়িয়ে থাকলেও লোক এখানে একেবারেই নেই। সকলেই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। এখানে আসার পর আমাদের নয়জনের মধ্যে পাঁচজনের জ্বর হলো। এর পরে আমাদের পক্ষে আর হেঁটে যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। রোহিণী চৌধুরীকে ধরলাম, যে করেই হোক একটি নৌকোর বন্দোবস্ত করো। শুনেছিলাম 'মনেয়াতে' আমাদের হাসপাতাল খোলা হয়েছে—সেই পর্যন্ত যাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। চৌধুরী ঘোরাঘুরির পর জানালে, এই জঙ্গলে থাকলে কোনও খবর পাওয়া যাবে না। নদীর ধারে গ্রামের যে বাজার আছে, সেখানে ঘর খালি আছে। আমরা সেখানে গিয়ে থাকলেই ভাল হয়। যাই হোক, আমাদের সাথী এতগুলি রুগী, বিপদকে ভয় করলে চলবে না। বাজারের ঘরে এসেই আশ্রয় নিলাম। রোহিণী চৌধুরী রেঙ্গুনে আলুর ব্যবসা করতো, মাসে লাভ কম করে প্রায় হাজার টাকা থাকতো। সবকিছু দান করলেও তার কাছে হাজার দুয়েক টাকা ছিল। কাজেই এখানে আসার পর আবার দোকান-পসার দেখে, খাওয়ার সখ জেগে উঠলো। মাছ, মাংস ও ভাত বহুদিন পরে একসাথে খেয়ে পরম পরিতৃপ্তি পেলাম। আবার লোকালয়ে এসে যে এমনিভাবে দিন কাটাবো—তা কয়েকদিন আগেও ভাবতে পারিনি। এখানে দু'দিন থাকার পর, চৌধুরীর অক্লান্ত চেষ্টার শেষে একটি নৌকোর যোগাড় হলো। ছোট নৌকো—আমরা নয়জন, আর এগারজন বর্মী ও মাঝি-মাল্লা তিনজন। ভাড়া ঠিক হলো একেবারে 'মনেয়া' পর্যন্ত দের হাজার টাকা। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় ভগবানের নাম নিয়ে নৌকোয় উঠে বসলাম। জায়গা একেবারেই কম। কোন রকমে একটু বসে যাওয়া! শরীর নড়াবার যো নেই। তবু হাঁটার চেয়ে এ যে শতগুণে ভালো।

আমরা বহু কষ্টে বসবার মতো একটু জায়গা পেলাম। অন্য যে এগারজন বর্মী ছিল তাদের মধ্যেও কয়েকজন অসুস্থ। একজন তো একেবারে শয্যাশায়ী। আমাদের মধ্যেও ডাঃ চৌধুরীর জ্বরের উপর আমাশয় শুরু হলো। যুক্ত প্রদেশবাসী দু'জনের মধ্যে একজনের প্রবল জ্বর। সারা রাত নৌকো চলার পর ভোরের আগে একটি গ্রামের পাশে নৌকো বাঁধা হলো। দিনের মতো গ্রামে আশ্রয় খুঁজে নিলাম। কারণ দিনের বেলা নদীতে নৌকো চালানো মোটেই নিরাপদ নয়। 'চিন্দুইন' নদীর দু'ধারেই অসংখ্য পল্লী। রাস্তা থেকে দূরে বলে, এ সকল পল্লী বিমান আক্রমণ থেকে এখনো পর্যন্ত রক্ষা পেয়েছে। গ্রামে দেখলাম, শুধু কাপড়ের অভাবটাই বেশী, চালের অভাব এদিকে নেই। কাপড়ের অভাবে অনেকেই খদ্দরের কাপড় ব্যবহার করছে। সন্ধ্যায় খাওয়া শেষ করে আবার নৌকোতে উঠে বসলাম। আগে এই নদী হেঁটে পার হয়েছি, আজ তারই কি ভীষণ মূর্তি! নৌকা স্রোতের মুখে ছেড়ে দিয়েছে, মাঝিরা শুধু নজর রেখেছে ঘূর্ণিস্রোতের উপর। অন্ধকার রাত, খালি নদীস্রোতের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আশপাশের গ্রাম থেকে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে ক্ষীণ আলোর রেখা। নদীর উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে অনেক বড় বড় গাছ, কাঠ, মৃতদেহ প্রভৃতি। আমাদের ছোট্ট নৌকোখানা আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে স্রোতের বেগে। সারারাত চুপচাপ বসে থাকা। চোখে ঘুম আসে অথচ ঘুমবার উপায় নেই। এমনিভাবে পঞ্চম দিনে পেঁছিলাম 'মিনজিন'। এখানে নদীর কাছাকাছি একটি বৌদ্ধমন্দিরে থাকবার জায়গা ঠিক করলাম। এখানকার বাজারে প্রায় সব কিছুই কিনতে পাওয়া যায়। পায়ে জুতো ছিল না, আড়াই টাকা দিয়ে কিনলাম একটি কাঠের খড়ম। বাজার থেকে মাংস কিনে আনা হলো। রুগীদের জন্য 'সুপ', অন্যদের জন্য মশলা দিয়ে রাঁধা। এখানে আজাদ হিন্দ লীগের সভাপতির সংগে দেখা করলাম। তিনি রেশনের জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'যা ইচ্ছা নিন।' চাল, ডাল, নুন, তেল, বিস্কুট, বিড়ি সব কিছুরই বন্দোবস্ত ছিল। আমার একটি খাকী সার্ট ছাড়া অন্য জামা ছিল না—তাই একটি খদ্দরের সার্ট ও একটি ছোট মশারি চেয়ে নিলাম। সন্ধ্যার পর বেশ জোরে বৃষ্টি হলো, কাজেই সে রাত্রিতে আর যাওয়া হয়ে উঠলো না। এখানে 'আজাদ হিন্দ দলের' কয়েকজন কর্মী আছে। তারা নৌকো করে খাদ্য

দ্রব্য এখান থেকে 'কালেওয়া' পর্যন্ত পাঠানোর বন্দোবস্ত করছে। ফ্রণ্টে আমাদের অবস্থার খবর পাওয়ার পরই এদিক থেকে সব রকম বন্দোবস্ত শুরু হয়। কিন্তু পথ বন্ধ তাই সব জিনিস নৌকো করে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। 'কালেওয়া'র আগে কোন বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর নয়। কাজেই 'কালেওয়া'তে আমাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা নিজেরা উপস্থিত থেকে সব কিছুর ব্যবস্থা করছেন।

দ্বিতীয় দিনেও আমরা 'মিনজিন' ছিলাম। সেখানকার লোকেরা তখন ভয় পেয়ে দূরের গ্রামগুলিতে চলে যাচ্ছে। কারণ, শুনলাম, বৃটিশ নাকি কাগজ ফেলেছে যে, গ্রামবাসীরা যেন মিলিটারী ক্যাম্প, স্টেশন ও নদীর তীরের গ্রামগুলি থেকে দূরে সরে যায়। বৃটিশ বেশ ভালো করেই জানতে পেরেছে যে পথ বন্ধ হওয়াতে জাপানীরা নদীপথ ব্যবহার করছে। সকালেই কয়েকখানা বিমান এসে নদীর উপর যেসব নৌকো ছিল তার উপর মেশিনগান চালায়। একটি ছোট জাপানী স্টীমার একেবারে লতাপাতা দিয়ে ঢাকা ছিল—তাতে গুলি লেগে আগুন লেগে যায়। আমরা মোটা দেওয়াল দেওয়া বুদ্ধমন্দিরের মাঝে বসে বসে অনবরত মেশিনগানের টিক টিক আওয়াজ শুনছিলাম। খানিক পরেই বিমানগুলি চলে গেল, কিন্তু সারাদিন প্রায় মাথার উপর পাহারা দিতে লাগলো। অন্ধকারে সন্ধ্যায় আমরা আবার নৌকো চালালাম। যে লোকটির জ্বর হয়েছিল তার অবস্থা বেশী খারাপ। বার বার উঠে দাঁড়াতে চায়। ভয় হতে লাগলো হঠাৎ না পড়ে যায়। সেইজন্য তার হাত পা বেঁধে দিলাম। নৌকো ছেড়ে দিয়ে মাঝিরা দেখি বেশ আরামে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। আমাদের চোখে মোটেই ঘুম নেই। নৌকো আপন মনে ভেসে চলেছে টানে। মাঝে মাঝে ঘূর্ণি দেখে আমাদের ভয় হয়। মাঝিকে ডেকে তুলি। সে ঘুম চোখেই জলের দিকে একটু তাকিয়ে বলে, 'কেসা মিশির' অর্থাৎ পরোয়া নেই। সে তো পরোয়া নেই বলে আবার বেশ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ে অথচ সেই বিরাট জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে আমরা বার বার ভয় পাই। যদি নৌকো একবার ঘূর্ণির মধ্যে গিয়ে পড়ে তা হলে মৃত্যু অবধারিত। একবার সত্য সত্যই নৌকো একেবারে ঘূর্ণিস্রোতের কাছাকাছি এসে পড়লো। তাড়াতাড়ি মাঝিকে ডাকতে তারা বহু কষ্টে নৌকো সরিয়ে আনে। এইভাবে সারারাত কাটিয়ে ভোরে আবার একটি ছোট গ্রামের পাশে নৌকো বাঁধা হলো। এখানে নেমে গ্রামে 'তাজি' অর্থাৎ সর্দারের কাছে আমাদের থাকা ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করতে বললাম। সে আমাদের থাকার জন্য একটি মন্দির ঠিক করে দিলে। তারপর দুপুর বেলা বর্মী মেয়েরা আমাদের জন্য ভাত তরকারী রেঁধে নিয়ে এল। এক একটি বাড়ি থেকে একজনের জন্য খাবার এল। তারা আমাদের খাইয়ে তাদের বাসন নিয়ে চলে গেল। বর্মীদের খাবার প্রথা হচ্ছে এইরকম—মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে তার উপর ছোট ছোট টেবিল দেওয়া হয়। কতকটা আমাদের দেশের জলচৌকির মতো। একটি বড় পাত্রে ভাত থাকে আর অন্য কয়েকটি পাত্রে থাকে তরকারী। সামনে খালি থালা থাকে, তাতে অল্প অল্প করে ভাত তরকারী তুলে নিয়ে খেতে হয়। আমাদের মতো থালায় সব ভাত একসঙ্গে নিয়ে বসলে বর্মীরা তা দেখে হাসে। সন্ধ্যাতেও এমনিভাবে গ্রাম থেকে ভাত তরকারী এল, আমরা তাই খেয়ে আবার নৌকোতে উঠলাম। শুনেছি বর্মার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বা ম প্রত্যেক গ্রামের 'তাজি'কে হুকুম শুনিয়েছেন যে, তারা যেন জাপানী ও আজাদ হিন্দ সৈন্যদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করে। সেই আদেশ মতোই হয়তো আমরা প্রত্যেক গ্রাম থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।

এইভাবে দিনে বিশ্রাম ও রাতে নৌকো চালিয়ে প্রায় দশদিনে 'মোলায়েক' থেকে নদীপথে একশো আশি মাইল পথ পার হয়ে ১৪ই আগষ্ট তারিখে 'মনেয়া' এসে পেঁছলাম। ভোরের একটু আগে পেঁছেছিলাম, কাজেই শেষ রাতটা নদীতীরেই কাটিয়ে দিলাম। ভোরে আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমাদের আই. এন. এ. হাসপাতালের খোঁজে বেরুলাম। হাসপাতাল কাছেই ছিল, খুঁজে নিতে বিশেষ কষ্ট পেতে হয়নি। হাসপাতালে প্রথমেই মেজর সত্যেশ ঘোষের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি আমার অবস্থা দেখে তো অবাক! তারপর বললেন, 'বাসু, তুমি ১লা জুলাই থেকে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হয়েছ।' আমি জানালাম, 'সে খবর পরে হবে, আগে আমার যে রুগী আছে তাদের হাসপাতালে আনার

বন্দোবস্ত করুন। তারপর একটু ভালো খাওয়ার ব্যবস্থা করুন।' রুগীদের আনবার জন্য তৎক্ষণাৎ এম্বুলেন্স গাড়ী পাঠানো হলো। হাসপাতাল সবে মাত্র খোলা হয়েছে। এখনো পর্যন্ত 'ফ্রন্ট' থেকে রুগী এসে পৌঁছায়নি। আমরাই প্রথম রুগীর দল। আমরা সকলেই হাসপাতালে ভর্তি হলাম। সকলেই আমাদের কাছ থেকে তখন খবর জানবার জন্য ব্যস্ত। কারণ আগের দিকে যে একটা বিপর্যয় ঘটেছে সে খবর সকলে জানলেও প্রকৃত ঘটনা জানবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। এখানে ডাঃ ঘোষ ছাড়াও হাসপাতালের কম্যান্ডার মেজর রঙ্গচারীকেও আগে থেকেই জানতাম। আমার অবস্থা দেখে সকলেই সহানুভূতি জানালেন। ঘোষ সাহেবের কাছ থেকে কিছু কাপড়-জামা যোগাড় করলাম। তারপর বহুদিন পরে গরম পরোটা ওমলেট সংযোগে চিনি ও দুধের চা খেলাম। আমাদের ডাঃ চৌধুরীও আমারই সঙ্গে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হয়েছেন। চৌধুরীকে আমাশয় বেশ শক্তভাবেই ধরেছে। যার যার জ্বর হয়েছিল, একেবারে বেহুঁস। এই হাসপাতালটির 'টামুর' কাছাকাছি 'পন্থা' যাওয়ার কথা ছিল, এবং সেজন্য তৈরী হয়েই তারা সিঙ্গাপুর থেকে এসেছিল। কিন্তু হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন হওয়াতে হাসপাতাল আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। হাসপাতালে প্রায় পাঁচশো রুগী রাখার মতো বন্দোবস্ত করা হয়েছে, আর এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে একটি আমবাগানেও প্রায় দুশো রুগী রাখার মতো ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দু'চার দিন পরেই মেজর আকবর আলী শাহ হাসপাতালে ভর্তি হলেন জ্বর নিয়ে। এদিকে চৌধুরীর আমাশয় কমে গেল, কিন্তু তাকে আবার জ্বরে ধরলো।

পথে আমার স্বাস্থ্য একেবারে খারাপ ছিল না, কিন্তু এখানে পৌঁছানর পরই আমাকেও ম্যালেরিয়া ধরলো। চৌধুরী ও শাহর জ্বর ক্রমে 'টাইফাস' বলে প্রমাণিত হলো। দু'জন ডাক্তার এইভাবে 'টাইফাসে' আক্রান্ত হওয়াতে হাসপাতালের প্রত্যেক ডাক্তার যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন নিয়ে তাদের চিকিৎসা ও সেবা শুরু করলেন। কিন্তু তাঁদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে ডাঃ শাহ ইহজগৎ থেকে বিদায় নিলেন। যথাবিধি সামরিক কায়দায় তাঁকে সেলামী দেওয়ার পর তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়। তখন চৌধুরীর অবস্থাও তত সুবিধার নয়, সেইজন্য শাহর মৃত্যুসংবাদ তাঁর কাছে গোপন রাখলাম। কিন্তু এ খবর চাপা রইলো না। চৌধুরী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুনলাম শা' নাকি মারা গেছেন।' আর গোপন রাখা চলে না, কাজেই জানালাম, খবর সত্য।

সেইদিন থেকে চৌধুরীর অবস্থাও ক্রমশ খারাপের দিকে যেতে লাগলো। 'ইনজেকশন' নেওয়ার পর আমার জ্বর সেরে গেল। যতটা সম্ভব চৌধুরীর সেবায় আত্মনিয়োগ করলাম। একদিন আমাকে বললে, 'বাসু, আমারও দিন ফুরিয়ে আসছে।' তাকে অনেক বোঝালাম, 'ভয়ের কোন কারণ নেই, তোমার জ্বর ছেড়ে গেছে, শুধু একটু দুর্বলতা আছে। দুধ একটু বেশী করে খেলেই ও দুর্বলতাটাকু কেটে যাবে।'

পরের দিন তিরিশে আগষ্ট বেলা প্রায় চারটার সময় চৌধুরী বললে, 'আমার শরীর বড় খারাপ লাগছে, একবার মেজর প্রসাদকে ডেকে দাও।' তৎক্ষণাৎ মেজর প্রসাদকে ডেকে নিয়ে এলাম। তিনি এসে একটি 'কোরামিন ইনজেকশন' দিলেন। বেলা প্রায় পাঁচটার সময় চৌধুরী তার নিজের আরদালীকে ডেকে সারা শরীর বেশ ভালো করে 'স্পঞ্জ' করালেন। বেলা প্রায় ছ'টার সময় অবস্থা একেবারে খারাপের দিকে যায়, রোগী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মেজর প্রসাদকে ডেকে আনলাম। 'সেলাইন' দেওয়া শুরু হলো, কিন্তু নাড়ীর কোনও উন্নতি না দেখে বুঝতে পারলাম আর বেশী দেরী নেই। সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় তার আত্মা আমাদের ছেড়ে অমরলোকে প্রস্থান করলো।

আমরা দু'জনে লক্ষ্ণৌতে একসঙ্গে ট্রেনিং নিয়েছি। মালয়েতে দেখা হয়েছে। আবার একই সঙ্গে ফ্রণ্টে এসেছি, একই সঙ্গে পিছু হঠেছি। নানা দুঃখকষ্টের মাঝে একই সঙ্গে কাটিয়ে আমাদের মধ্যে হয়েছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। আজ সেই দুঃখকষ্টের সাথী পুরাতন বন্ধুকে হারিয়ে প্রাণে যে বেদনা পেলাম তা জানাবার নয়। চারিদিকে মৃত ও মৃত্যু দেখে হৃদয় অনেকটা পাষাণে পরিণত হলেও আজ প্রিয় বন্ধুর বিয়োগে অশ্রু সংবরণ করতে

পারলাম না। যখন আমরা পিছু হঠতে শুরু করি তখন প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম যে, যদি কারো মৃত্যু হয় তবে তার মৃতদেহ পথের ধারে ফেলে না রেখে তার শেষকৃত্য করে তবে অন্যরা সে জায়গা ছাড়বে। সে অবস্থা পার হয়ে আজ হাসপাতালে বন্ধুকে হারালাম।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, কাজেই আজ আর শেষকৃত্য হতে পারে না। মৃতদেহ যত্নসহকারে রেখে দেওয়া হলো কাল সকালে যথাবিধি কাজ করার জন্য। ঠিক পাঁচটি বছর পূর্ণ হয়েছে তাঁর চাকরীর। আমাদের পরিচয়ের আজ পূর্ণ হলো পাঁচটি বছর, সব কিছু শেষ হলো আজই।

ইতিমধ্যে হাসপাতালে বহু রুগী ভর্তি হয়েছে আর প্রতিদিন কমপক্ষে দশ-পনের জন করে মারা যাচ্ছে। তাদের সৎকার করা প্রায় অসম্ভব। রাবণের চিতার মতো একটি চিতা জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে প্রায় এক মাইল দূরে। মৃতদেহগুলি নিয়ে গিয়ে তারই মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে।

সেই সময়ে সেখানে আমাদের এ. ডি. এম. এস. কর্নেল 'রয়' ছিলেন। সকালে হাসপাতালের সব ডাক্তার মিলে স্ট্রেচারে করে আমরা চৌধুরীর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গেলাম। সেখানে সামরিক কায়দায় আমরা সকলেই অভিবাদন করলাম। তারপর একটি নূতন চিতা তৈরী করলাম তার জন্য। পরে অন্যান্যরা সকলেই চলে এলেন। আমি, সাব-অফিসার গুপ্ত, মেজর ঘোষ, আমরা ও চৌধুরীর আরদালী শেষ পর্যন্ত চিতা ধুয়ে বেলা প্রায় চারটেয় ক্যাম্পে ফিরলাম। চৌধুরীর মৃত্যুতে প্রাণ আঘাত পেয়েছি, তার উপর সারাদিন আগুনের কাছে থাকাতে আমার আবার জ্বর এল। তখন অন্য হাসপাতালটির কাজ শুরু হয়েছে। আমি মেজর রঙ্গচারীকে, আমাকে সেখানে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করলাম। কারণ এই হাসপাতাল আর আমার কাছে ভালো লাগছিল না। যেদিন চৌধুরীর মৃতদেহ সৎকার করি সেইদিন সন্ধ্যায় তার খালি বিছানায় এসে ভর্তি হলো—আর একজন বাঙালী, চন্দ্র। ভদ্রলোক আগে পোস্ট অফিসে কাজ করতেন, পরে 'সিঙ্গাপুর ব্রডকাস্টিং'-এ কাজ করেছেন। তখন তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়। পরে জাপানী ভাষা ভালো করে শিক্ষা করার পর তিনি 'হিকারী কিকনে' দোভাষীর কাজ করতেন। বহুদিন থেকেই জ্বরে কষ্ট পাচ্ছেন। ভর্তি হওয়ার পরেই আমাকে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আমার আর বেশী দিন বাকী নেই।' তাঁর অবস্থা দেখে অবশ্য তাই মনে হলো; তবু প্রবোধ দিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে তিনিও মারা গেলেন। এর পরে আমার আর এখানে একেবারেই ভালো লাগলো না, কাজেই আমিও তাড়াতাড়ি 'মাহু' হাসপাতালে চলে গেলাম সেখানে ডাক্তার ছিলেন মেজর ঘোষ। দু'শোর উপর রুগী। কাজেই আমার নাম রুগীর তালিকাতে থাকলেও সকাল বেলাটা আমাকেও ডাক্তার হিসেবে কাজ করতে হতো। এই হাসপাতালটি ছোট একটি বাগানের মধ্যে। গ্রাম এখান থেকে দুই-এক মাইল দূরে দূরে। আমরা রোজ সন্ধ্যার সময় বাইরে রাস্তায় বেড়াতে যেতাম। রুগী অনেক আসতো। 'কালেওয়া'তে একটি হাসপাতাল খোলা হয়েছে, তবে সেখানে বিমান আক্রমণ খুব বেশী—কাজেই যতটা সম্ভব বেশী সংখ্যায় রুগী পাঠানো হচ্ছে 'ইউ'-তে। 'ইউ' থেকে রেলপথে ও লরীতে রুগী আসছে মনেয়া ও মাহু'তে। বেশীর ভাগই হচ্ছে আমাশয় ও পুরাতন ম্যালেরিয়া। রুগীরা যে অবস্থায় হাসপাতালে এসে পৌঁছচ্ছে সে দৃশ্যও বড় করুণ। ক্ষীণ, দুর্বল দেহ, পরনে জামা-কাপড় নেই। অনেকে আবার বহুদিন ঠিক মতো খেতে না পাওয়াতে খুব বেশী খেতে আরম্ভ করেছে 'কালেওয়াতে' আর সঙ্গে সঙ্গে অসুখ। আমি এ-ক্যাম্পে আসার পর আজাদ হিন্দ দলের নাহার মৃত্যু হয় মনেয়া হাসপাতালে।

আমাদের যারা 'কালেওয়া' থেকে আসছে তাদের মুখে শুনলাম, বহু নূতন নূতন জাপানী সেনা এগিয়ে যাচ্ছে আর পুরনো অসুস্থ সেনারা ফেরত আসছে। আমরা খাদ্য ও গোলাগুলীর অভাবেই পিছু হটতে বাধ্য হয়েছি, কাজেই বৃটিশ যে খুব শীঘ্র এগিয়ে আসতে পারবে না, তা বেশ ভালো করেই জানতাম।

আমাদের হাসপাতালে রোগীদের জন্য খুব ভালো বন্দোবস্ত ছিল। খাওয়া তো ভালো ছিলই, তাছাড়া আমরা যথেষ্ট ডিম ও দুধ কিনতাম। প্রায় প্রত্যেক রোগীই প্রত্যহ

আধসের দুধ ও একটি ডিম পেতো। নেতাজীর আদেশ ছিল—"রোগীদের বাঁচাবার জন্য যত টাকা খরচ করতে হয় করবে, তাতে কিছুমাত্র কার্পণ্য যেন না হয়। কারণ টাকা যথেষ্ট পাওয়া যাবে, কিন্তু একটি প্রাণ গেলে তা ফিরে পাওয়া যাবে না।"

আমি যখন হাসপাতালে, তখন আমাদের রেজিমেণ্টগুলি আস্তে আস্তে ফেরত আসছিল। সুভাষ রেজিমেণ্ট মনেয়া থেকে বিশ মাইল দূরে একটি গ্রামে ক্যাম্প করেছে। গান্ধী রেজিমেণ্ট সোজা চলে যাচ্ছে মান্দালয় আর আজাদ রেজিমেণ্ট 'মাহু' থেকে মাত্র নয় মাইল দূরে 'চাঙগুতে' ক্যাম্প করেছে। অবশ্য রেজিমেণ্টগুলি শুধু নামেতেই আছে। তাদের বেশীর ভাগ অফিসার ও সিপাহী সকলে রোগী হিসাবে হাসপাতালেই ভর্তি হয়ে আছে। আমি এখনও 'এটিব্রিন' খাচ্ছি, কাজেই আমার পক্ষে ক্যাম্পে যাওয়া সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় ডাক্তার চৌধুরী মারা গেছে, তৃতীয় ডাক্তার প্রশারকরের এখনও কোন খবর নেই। অথচ একজন ডাক্তারের দরকার, কাজেই হাসপাতাল থেকে সাব-অফিসার গুপ্তকে সেখানে পাঠানো হলো।

আমি তখনও 'মাহু' হাসপাতালে। একদিন সকালে কর্নেল গুলজারা সিং ও কর্নেল হাবিবর রহমান এসে হাজির। আমাকে দেখে উভয়েই খুব আনন্দিত হয়ে 'শেক হ্যাণ্ড' করলেন। তারপর কর্নেল গুলজারা সিং সাহেব বললেন, 'বাসু, তোমাকে এখনো অসুস্থ দেখছি। শীগ্‌গীর ভালো হয়ে নাও। আমাদের ডাক্তারেরও অভাব।' আমি উত্তরে জানালাম, 'এটিব্রিন' চিকিৎসা শেষ হলেই আমি যাবার জন্য প্রস্তুত।

একদিন শুনলাম নেতাজী 'ইউ'-তে এসে পেঁাচেছেন। তাঁর বিশেষ ইচ্ছা ছিল 'কালেওয়া' পর্যন্ত যাবেন, কিন্তু পথে এক জায়গাতে প্রায় দশ মাইলের উপর পথ হাঁটতে হবে বলে অন্যান্য অফিসাররা তাঁকে আগে যেতে দেননি। আমাদের হাসপাতালে হয়তো যে কোনও সময়ে এসে পড়তে পারেন। আমরা যেন সব সময় তৈরী থাকি। তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো, তিনি এলে কি কি প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং তার যথাযথ উত্তর কি হতে পারে।

তিনি ডাক্তার না হলেও এমন প্রশ্ন সময় সময় করতেন, যাতে ডাক্তারকেও উত্তর দেবার জন্য একটু ভাবতে হতো। কাজেই আমরাও সব কিছু প্রশ্নের জন্য তৈরী হতে লাগলাম। 'রেশন' প্রত্যেকে কত পায়? প্রত্যেকটি জিনিসের 'ক্যালোরিক' মূল্য কত? একজন রোগী প্রকৃতপক্ষে তার যতটা দরকার ততটা খাদ্যমূল্য পাচ্ছে কিনা? আমরা রোজই তৈরী হয়ে থাকতাম, কিন্তু তিনি বিশেষ কারণে আসতে পারলেন না। 'ইউ' থেকেই রেঙ্গুনে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি আমি মাহু থেকে চাঙগু ক্যাম্পে ফিরে এলাম। এ জায়গাটি বেশ সুন্দর। ছোট্ট একটি শহর। আমরা সকলে এখানকার বৌদ্ধ মন্দিরে থাকতাম। এখানে অনেক 'ফুঙিগ চঙ্গ' অর্থাৎ বৌদ্ধ মন্দির আছে বলেই এ জায়গার নাম 'চাঙগু'। এখানে এ পর্যন্ত আমার রেজিমেণ্টের মাত্র দশ-বারোজন অফিসার ও প্রায় তিনশো সিপাই এসে পেঁাচেছে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই চর্মরোগে ভুগছে। হাসপাতাল একেবারে ভর্তি, রোগী আর সেখানে পাঠানো সম্ভবপর নয়। আমার কাছে ঔষধও বেশী নেই। একমাত্র নিমপাতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। নিমপাতার জল সিদ্ধ করে তাদের সারা শরীর ধোয়ানো হতো। তারপর নিমপাতা বেটে তাই মাখানো। এখানেও ডিম ও দুধ পাওয়া যেতো। রোগীদের যথেষ্ট পরিমাণে খেতে দিতাম। আমরা এখানে বেশ আমোদেই থাকতাম। বহুদিন পরে নানা দুঃখকষ্ট অতিক্রম করে আবার সুখের মুখ দেখতাম।

এখানে আশপাশের সব গ্রাম নিয়ে প্রায় একশো ভারতীয় ছিল। আগে এখানে কোনও লীগের প্রতিষ্ঠা হয়নি। আমরা আসার পর পর কয়েকজন অফিসার উদ্যোগী হয়ে এখানে ভারতীয় লীগের প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় ডাক্তার বড়ুয়া লীগের সভাপতি হন।

আমরা সকলে আবার সমবেত হওয়ার জন্য আনন্দ প্রকাশ করে ছোট একটি পার্টি হয়। তাতে সকলেই আমাকে ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হওয়ার জন্য একটি পার্টি দেওয়ার অনুরোধ করেন। হাতে পয়সা কম, কাজেই কর্নেল সাহেব অবস্থা বুঝতে পেরে আমাকে

একশো টাকা দেন। তাই দিয়ে আমি একটি ছোট্ট পার্টির বন্দোবস্ত করি। সেদিন সকলেই চৌধুরীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে কর্নেল সাহেব দুঃখের সঙ্গে চৌধুরীর সেই ছুটি চাওয়ার কথাটির উল্লেখ করেন। ইম্ফল থেকে তাঁর বাড়ি ছিল মাত্র একশো মাইলের মধ্যে, তাই অতি দুঃখেই তাকে ফিরে আসতে হয়েছে। কিন্তু এ দুঃখ সে সহ্য করতে পারেনি। তবে দুঃখের মাঝেও আমরা গৌরব অনুভব করেছি যে, সে দেশের জন্যই কষ্ট স্বীকার করেছে, দেশের কাজেই প্রাণ উৎসর্গ করেছে।

'চাঙগু' ছোটখাট বেশ একটি সুন্দর জায়গা। স্টেশন এখান থেকে প্রায় এক মাইলের উপর। মাঝে মাঝে বিমান এসে স্টেশনের কাছাকাছি একটি পুলের উপর বোমা ফেলে চলে যেতো। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, রোজ রোজ বোমা খেয়েও পুলটি ভাঙতো না, কাজেই বিমানগুলির আসা একেবারে ধারাবাহিক হয়ে উঠেছিল। আমরা দূর থেকে দেখতাম কিভাবে বোমাগুলি পড়ছে। এখানে যেদিন বোমা পড়তো, সেদিনই বিমান থেকে অনেক 'প্রোপাগান্ডা' কাগজও ফেলা হতো। তার মধ্যে একটি থাকতো সাপ্তাহিক 'Sky Bulletin'। বর্মী ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই কাগজ ফেলা হতো। তাতে বৃটিশ কোথায় কোথায় অগ্রসর হচ্ছে, জার্মানীর অবস্থা কি—সব কিছু ম্যাপ দিয়ে দেখানো হতো।

'চাঙগুতে' কয়েক ঘর 'অ্যাংলো বর্মীজ' থাকতো। কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করে তাদের একপাশে রাখা হয়েছিল। তারা সেখান থেকে তিন মাইল এলাকার বাইরে যেতে পারতো না। বেলা তিনটের পর যাওয়ার হুকুম ছিল না। তবে বিশেষ কাজে পুলিশের অনুমতি নিয়ে বিকালে ও সন্ধ্যাতেও বাইরে আসতে পারতো। এখানে একটি গীর্জা আছে। সেখানে বহু ইভাকুয়ী ইউরেশিয়ান সপরিবারে বাস করতো।

একমাত্র সকালের দিকে বিমানগুলি নিয়মিতভাবে পুলটি আক্রমণ ছাড়া এখানে যুদ্ধের অন্য কোনও উপদ্রব ছিল না। বিকালে মাঠে ফুটবল ম্যাচ প্রায় রোজই হতো। তাছাড়া ব্যাডমিণ্টন, লেডিজ ভলিবল প্রভৃতি খেলাও পুরাদমে চলতো। সন্ধ্যার পর প্রায় প্রতি গৃহেই গ্রামোফোনের সুমধুর প্রতিধ্বনি শোনা যেতো। দোকানপাটও ঠিকভাবেই খোলা হতো। এমন কি মাঝে মাঝে সখের দলের থিয়েটার পর্যন্ত হতো। আমরা এখানে আসার পর এখানকার প্রত্যেকেই আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করতো। মাঝে একটু গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের বৌদ্ধ মন্দিরে থাকা নিয়ে। এখানে মন্দির এলাকার মধ্যে জুতা পায়ে দেওয়া একেবারে নিষিদ্ধ; অবশ্য বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই আইনের বাইরে। আমরা দিনরাত মন্দিরের ভিতরে জুতা ব্যবহার করতাম বলে অনেক বর্মী তাতে আপত্তি করে। পবিত্র মন্দির এতে অপবিত্র করা হয়, বুদ্ধদেবকে অপমান করা হয়। কিন্তু কয়েকজন বিশিষ্ট বৌদ্ধ ভিক্ষু তাদের বুঝিয়ে দেন যে, সৈনিক হিসাবে এরা দিনরাত জুতা ব্যবহার করে। ইচ্ছাপূর্বক কেউ বুদ্ধদেবকে অপমান করে না। সৈনিকরা দেশরক্ষা করে, কাজেই তারা এইভাবে জুতা ব্যবহার করলে তা মোটেই দোষণীয় নয়। যাহোক, কিছুদিন থাকার পর আমাদের ব্যবহারে সকলেই যথেষ্ট সন্তুষ্ট হয়। কারণ প্রত্যেক দেশের সৈন্যদলের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়, যা আমাদের সৈন্যদের মধ্যে একেবারেই ছিল না। আমরা যেখানেই গিয়েছি, আমাদের সৈন্যদের বিরুদ্ধে একটুকু অভিযোগ আমাদের শুনতে হয়নি। তাদের এত সুন্দর ব্যবহার করার প্রধান কারণই হচ্ছে দেশের প্রতি ও নেতাজীর প্রতি তাদের অসীম শ্রদ্ধা।

এখানে আমাদের সৈন্যরা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতো। অনেক বর্মী তাদের বাড়ি এদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যেতো। সকলেই বলতো, এমন কি বর্মী সৈন্যদের চাইতেও আমাদের সৈন্যদের ব্যবহার শতগুণ ভালো। তবু তো ভাষাগত পার্থক্য যথেষ্ট আছে।

পূজা কোথায়, কবে কেটেছে খবর পাইনি, কিন্তু দীপালির খবর এখানে পেলাম। ভারতবর্ষের বাইরে হিন্দুদের একটিই হচ্ছে প্রধান উৎসব। মালয়েতেও দেখেছি, এখানেও দেখলাম। দেওয়ালীর রাতে এখানকার কয়েকজন ভারতীয় ব্যবসায়ী আমাদের প্রায় সব অফিসারকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। রাতে আলো সকলে বড় ভয়ে ভয়ে জ্বালাতো, তাই দীপান্বিতার রাত্রিতেও জ্বলে উঠলো মাত্র কয়েকটি প্রদীপ। তাও বিমানের আওয়াজ শুনলে

তা নির্ভিয়ে দেবার জন্য পাখা হাতে নিয়ে একজন করে লোক তৈরী থাকতো। আমরাও বৌদ্ধ মন্দিরের ভিতরে কয়েকটি দীপ জ্বালিয়ে দীপালি উৎসব করলাম।

এখানকার লীগ প্রেসিডেণ্ট ডাঃ বড়ুয়া বর্মী বিবাহ করে অনেকদিন থেকেই এখানে বসবাস করছেন। বাঙালী তিনি ছাড়া আর মাত্র একজন ছিলেন। কাজেই প্রায় রোজ সন্ধ্যাতে আমি তাঁর বাড়ি যেতাম। অনেক রাত অবধি গল্প করতাম। এখানকার লোকেরা আমাদের মুখে লড়াইয়ের গল্প অনেক শুনতো। এখানে বৃটিশ তরফ থেকে অনেক কাগজ পড়তো, তার উপর কয়েকজন অ্যাংলো-বর্মী থাকাতে প্রকৃত খবর কতকটা গোপন হতো, কতকটা বা অন্যরূপে প্রকাশ পেতো। আমাদের কাছে সব শুনে তারা অনেক সময় বলতো, 'আমরা তো শুনেছি অন্যরূপ।'

কিছুদিন পর এখানে আমাদের রেজিমেণ্টের ডাক্তার হয়ে এলেন মেজর এম. পি. মিশ্র। তিনি আসার কয়েকদিন পরেই আমার আবার জ্বর হয়। প্রথমদিন তো এমনি কাটলো। দ্বিতীয় দিন থেকে কুইনাইন খেতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু জ্বর কিছুতেই ছাড়ে না। পঞ্চম ও ষষ্ঠদিনে ডাঃ মিশ্র কুইনাইন 'ইনজেকশন' দিলেন কিন্তু তবু জ্বরের উপশম না হওয়াতে তিনি আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিলেন। সপ্তম দিনে বাধ্য হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলাম। যে জ্বর ছাড়াবার জন্য এত চেষ্টা, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরই তা সেরে গেল। কিন্তু দুর্বলতা খুব বেশী থাকাতে ডাক্তাররা পরামর্শ দিলেন আরও কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে। এখানে ক্যাপ্টেন যোশীও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বেরিবেরি হওয়ার দরুন। ডাঃ যোশী সুভাষ রেজিমেণ্টের সঙ্গে 'হাকা' ফ্রণ্টে গিয়েছিলেন। আমরা দু'জনে পাশাপাশি বিছানা লাগিয়ে একে অপরকে শোনাতে লাগলাম নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কাহিনী। এইভাবে প্রায় দশ দিন হাসপাতালে কাটানোর পর শুনলাম আমাদের এখান থেকেও শীঘ্র মান্দালয় যেতে হবে। রোগীদের পাঠানোর বন্দোবস্ত হতে লাগলো, কাজেই আমি আমার রেজিমেণ্টে ফিরে এলাম। এখানে সকলে মান্দালয়ে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছে।

আমাদের সরিয়ে জাপানীরা এসব জায়গা অধিকার করতে চায়। তাদের ইচ্ছা চিন্দুইন নদীর ওপারে বৃটিশের অগ্রগমন রোধ করা। ঠিক হলো প্রথমে রোগীর দল নিয়ে আমি মান্দালয় যাবো। দ্বিতীয় দলে ঔষধের বাক্স প্রভৃতি নিয়ে যাবেন ডাঃ মিশ্র এবং তৃতীয় ও শেষ দল নিয়ে যাবেন সাব-অফিসার মেনন। হঠাৎ এখান থেকে চলে যাচ্ছি শুনে সকলেই বিশেষ দুঃখিত হলো, বিশেষ করে এখানকার ভারতীয়রা। কবে নাগাদ ঠিক যাবো তা গোপন রাখা হয়েছিল। আমার যাবার দিনই কয়েকটি বাড়ি থেকে আমার নিমন্ত্রণ আসে খাওয়ার জন্য। সেইদিনই চলে যাচ্ছি সুতরাং একদিনে সব নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা অসম্ভব। প্রথমে গেলাম ডাঃ বড়ুয়ার বাড়ি। তিনি দুঃখ করে জানালেন, 'আপনি এত শীগ্‌গির চলে যাবেন তা ভাবতেও পারিনি, তাই আপনাকে একদিন খাওয়ানো পর্যন্ত হয়নি। সৈন্যদলের মধ্যে বাঙালী তো একেবারেই দেখা যায় না, তবু আপনাকে কিছুদিন পেয়ে বেশ আনন্দে দিন কেটেছে।' কয়েকখানা পুরী ও চা খেয়ে সেখান থেকে বিদায় নেওয়ার পরই পথের মাঝে মিঃ ভিনাইগম আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। তিনি শুনতে পেয়েছেন আমি শীগ্‌গির যাচ্ছি, অথচ সে 'শীগ্‌গির' যে 'আজ' তা তিনি জানতেন না, আমিও জানালাম না। সম্ভব হলে পরে একদিন খাওয়া যাবে, এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরে পড়লাম। সন্ধ্যাকালে প্রায় দেড়শো সৈন্য (তার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশজন রোগী) নিয়ে স্টেশনে এসে পেঁছিলাম। রাত প্রায় দশটা নাগাদ গাড়ি এল। কতকগুলি খোলা গাড়ি চালের বস্তাতে ভর্তি ছিল, আমরা তাতেই উঠে বসলাম। একটুকু জায়গা খালি নেই। গাড়ি চলতে লাগলো। খানিক পরেই খোলা গাড়িতে চড়ার ফলভোগ করতে হলো। ইঞ্জিন কয়লার অভাবে কাঠে চলে, কাজেই, ছোট ছোট কাঠের আগুন উড়ে এসে গায়ে পড়তে লাগলো। তাতে কাপড় জামা অল্প অল্প পুড়তে লাগলো। শুনেছিলাম পথে 'মু' (Mu) নদীর পুল নাকি ভেঙ্গে গেছে, হয়তো আজ রাতেই 'সাগাই' পেঁছান যাবে না। কিন্তু ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, তাই, দেখতে পেলাম পুল কতকটা মেরামত হয়ে গেছে। তবে পুলের উপর দিয়ে 'ইঞ্জিন' যেতে

পারবে না। কাজেই এদিককার ইঞ্জিন আমাদের গাড়ি ঠেলে পার করে দিলে, ওপার থেকে অন্য ইঞ্জিন এসে গাড়ি টেনে নিলে। প্রায় ভোরের দিকে আমরা সাগাই এসে পেঁছিলাম। রোগীদের স্টেশন থেকে অল্প দূরে একটা গাছতলায় বসিয়ে রেখে আমরা ক্যাম্পের সন্ধানে বেরুলাম। খানিক পরেই ক্যাম্প খুঁজে পেলাম এবং ক্যাম্প কমান্ডারকে রোগীদের আনার জন্য বন্দোবস্ত করতে অনুরোধ করলাম। কিছুক্ষণ পরে লরী করে রুগী নিয়ে আসা হলো। তাদের জন্য আলাদা একটি বাড়ি ঠিক করা ছিল, সেখানেই আপাতত আমরা একটি অস্থায়ী হাসপাতাল খুলে তাদের সামরিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলাম।

সাগাইতে মাত্র তিনদিন ছিলাম। আগে একজন বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর খোঁজ পেলাম না। তাঁর একটি মেয়ে এখানে একটি দোকান করেছেন। তাঁর কাছে শুনলাম তিনি মারা গেছেন। মেয়েটি, মা বর্মী হলেও, বাঙলা খুব সুন্দর বলতে পারেন। তাঁর একটি বোন এখানকার জাপানী হাসপাতালে নার্সের কাজ করেন। তাঁর সঙ্গেও দেখা হলো। শুনলাম জাপানী হাসপাতালগুলি একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে। তাদের হাসপাতালে এত রুগী যে, অনেকে শুধু গাছতলাতেই পড়ে আছে। প্রতি দিন তাদের মৃত্যুও হচ্ছে। জাপানীরা ঠান্ডা দেশের লোক, একে এদেশের গরম তারা সহ্য করতে পারে না, তারপর ম্যালেরিয়া। আমাদের পক্ষে ম্যালেরিয়াটা গা-সওয়া, কিন্তু তারা ম্যালেরিয়া সহ্য করতে পারে না। বহু জাপানী ম্যালেরিয়াতেও মারা গেছে। আমাদের পিছনে আসতে দেখে অনেকে যুদ্ধের খবর জানতে চায়, আর আমাদের পিছু হটার কারণও জানতে চায়। জাপানীদের কাছে অনেক সৈন্য আছে, তাদের একদল ক্লান্ত হয়ে পড়লে অন্যদল তাদের বদলে আসে। কিন্তু আমাদের সৈন্যসংখ্যা কম। একদলের পরিবর্তে অন্যদল পাঠানো একেবারে অসম্ভব। কাজেই পিছু হটে বিশ্রাম করা ছাড়া আমাদের অন্য কোনও উপায় ছিল না।

এখান থেকে মান্দালয় যাওয়ার দিন মেজর প্রিতম সিং-এর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি যাচ্ছেন মান্দালয়। তাঁর কাছে একখানা লরী ছিল। তাঁকে জানালাম, আমার কাছে কিছু রোগী আছে, তারা হাঁটতে একেবারে অক্ষম। যদি তিনি তাঁর লরী করে তাদের নদীর পারে পেঁছানর বন্দোবস্ত করেন তবে বিশেষ ভালো হয়। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজী হলেন। আমি সন্ধ্যার আগেই সকলকে নদীর তীরে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর মেজর সাহেবকে জানালাম, তিনি যেন মান্দালয় পেঁছেই ঘাটে লরী পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা ইরাবতী নদী পার হই। তারপর পেঁছেই দেখি লরী প্রস্তুত। রোগীদের নিয়ে আবার সেই 'কৃষি কলেজ' ক্যাম্পে উপস্থিত হলাম। রাত তখন প্রায় দুটো। কাজেই রোগীদের হাসপাতালের বারান্দায় রাতের মতো শোবার ব্যবস্থা করে নিজে আশ্রয়ের সন্ধান করতে লাগলাম। শুনলাম, এখানকার হাসপাতালের ডাক্তার হচ্ছেন মেজর বাওয়া ও ক্যাপ্টেন মল্লিক। খোঁজ করে মল্লিকের ঘরে এসে হাজির হলাম। সেখানে এসে দেখি ডাঃ কানাই দাস ও ডাঃ প্রশারকর এসে হাজির হয়েছেন। বহুদিন পরে আবার প্রশারকর ও দাসের সঙ্গে দেখা, কাজেই সেই গভীর রাতেই খানিকটা হৈ চৈ করলাম। রাতের মতো সেই ঘরের মেঝেতেই বিছানা পেতে ঘুম।

সকালে ওঠার পর আবার খুব কলরব শুরু হলো। প্রশারকরের কোন খবর আগে পাইনি, শুনলাম তিনি টামু থেকে 'সিবোর' রাস্তা ধরে পরে মার্চিনা-মান্দালয় রেললাইন দিয়ে মান্দালয় আসেন। এখানে আসার পর মেমিও হাসপাতালে ভর্তি হন। মাত্র দু'দিন আগে সেখান থেকে এখানে এসে পেঁচেছেন।

আমার রোগীদের সব কিছু বন্দোবস্ত করলাম। এখানে পেঁছানোর পর যুদ্ধের কিছু খবর শোনা গেল। বৃটিশ বড় একটা আগে বাড়ছে না, তবে মাঝে মাঝে দু' এক জায়গাতে 'প্যারাট্রুপ' কিছু কিছু নামিয়েছে। টামু থেকে 'কালেওয়ার' রাস্তা শুধু জঙ্গলে ভর্তি। কাজেই জাপানীরা বৃটিশকে চিন্দুইন নদীর পরপারে আটকাতে চায়। ওদিকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে যুদ্ধ খুব জোর চলছে। মালয়েতে যে জাপানী সেনাপতি যুদ্ধে জয় করেছিলেন, সেই জেনারেল ইয়ামাসিটা (তিনি মালয়ের ব্যাঘ্র নামে পরিচিত) বর্তমানে ফিলিপাইনে বদলী হয়েছেন। তাঁর উপর জাপানীদের অগাধ বিশ্বাস। আমাদের বর্মা

ফ্রন্টে জাপানী বিমান কমে যাওয়ার এই একটি কারণ। যেহেতু জাপানীদের পক্ষে বর্মার চাইতে ফিলিপাইনের যুদ্ধের গুরুত্ব অনেক বেশী। আমেরিকানরা তাদের অসংখ্য বিমান-বহর এনেছে প্রশান্ত মহাসাগরে। যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করেও তারা ছোট ছোট দ্বীপগুলি অধিকার করে বিমানের আড্ডা গড়ে তুলছে। এইভাবে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে তারা জাপান দ্বীপ আক্রমণ করতে চায়। জাপানীরা তাদের বীরবিক্রমে বাধা দিয়েও তাদের গতিরোধ করতে সমর্থ হচ্ছে না। ওদিকে জার্মানীর অবস্থাও খুব খারাপ।

মান্দালয় পেঁছানোর পরই আবার আমার জ্বর হয়। মল্লিক আমাকে মেমিও হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু আমি তাতে রাজী হইনি। আমার রেজিমেণ্ট শীঘ্রই 'পিমনা' (Pyimana) যাবে; কাজেই, আমার পক্ষেও যতটা শীঘ্র সেখানে পেঁছানো সম্ভব ততটাই ভালো। আমি কৃষি কলেজেই থেকে গেলাম। কয়েক দিন পর মেজর মিশ্র এসে পেঁছোলেন। তিনি আমার অবস্থা দেখে বললেন, 'বাসু, তোমার আরো কিছুদিন এখানে বিশ্রাম করা দরকার। আমি সকলের আগে পিমনা গিয়ে রুগীদের সব কিছু বন্দোবস্ত করবো—তুমি পরেই এসো।' আমার শরীর অসুস্থ হলেও আমরা বেশ আমোদেই এখানে দিন কাটাতাম। বৃটিশের বিমানগুলি দিনরাত ঘোরাঘুরি করলেও জাপানীদের বিমান-ধ্বংসী কামানগুলির প্রতাপে বেশী নীচে নামতে পারতো না। মাঝে মাঝে খুব উপর থেকেই বোমাবর্ষণ হতো, তবে তা বিশেষ কার্যকরী হতো না। এখানে খাওয়া ও থাকার বেশ ভালো বন্দোবস্ত ছিল। আমরা দিনের বেলায়ও বেশ নির্ভয়ে এখানে কাজ করতাম।

আমাদের ক্যাম্প থেকে প্রায় চার মাইল দূরে 'মান্দালয় হিল'; সেই পাহাড়ের নীচেই আমাদের গান্ধী রেজিমেণ্টের ক্যাম্প। ডাঃ বীরেন রায় ফ্রন্ট থেকে আসার পর তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। একদিন দুপুরে সেখানে হাজির হলাম। আমি ও বীরেন কলকাতাতে প্রায় একসঙ্গেই ডাক্তারী পড়ি। অনেক দিন পর দেখা হওয়াতে খুবই আনন্দ হলো। ডাঃ বীরেন রায়, ডাঃ চান্‌কে—নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও রণক্ষেত্রে বহু আহতের সেবা করেছেন। তাঁদের কমাণ্ডার আই. জে. কিয়ানী তাঁদের কাজের জন্য উচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং এঁদের পদোন্নতির জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করেছেন। ডাঃ চান্‌কে একজন মারাঠী, কিন্তু বাঙালীদের সঙ্গে মিলেমিশে এত সুন্দর বাঙলা বলতে পারেন যে, হঠাৎ তাঁর সঙ্গে কথা বললে, তাঁকে বাঙালী বলে ভুল করা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। এঁদের ছাড়া আরও কয়েকজন পুরানো অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে এলাম।

কিছুদিন পর সুভাষ রেজিমেণ্টের ডাঃ রাও এসে হাজির হলেন। তাঁর সঙ্গে একবার টামুতে দেখা হয়েছিল। রাও বাঙলা বলতে না পারলেও বেশ বুঝতে পারতেন, কারণ তিনি চার-পাঁচ বছর কলকাতায় ছিলেন। কলকাতার বিখ্যাত 'এরিয়ান ক্লাবে' তিনি কয়েক বছর খ্যাতির সঙ্গে ফুটবল খেলেছেন। এর পর 'আকে বোনামুরা' থেকে ডাঃ ইলিয়াস (ক্যাপ্টেন) ও ডাঃ নিরঞ্জন দাস (লেফটেন্যাণ্ট) এসে উপস্থিত হলেন। কাজেই আমাদের গৃহ ও গ্রহ দুই-ই পূর্ণ হলো। তা' ছাড়া চাঁদিনী রাতে সন্ধ্যার পর ক্যাপ্টেন চান্‌কে ও ক্যাপ্টেন রায় প্রায়ই এসে আমাদের দলে যোগ দিতেন। আমাদের অত্যাচারে অন্যান্য অফিসাররা মাঝে মাঝে একটু যে বিরক্ত বোধ না করতেন তা নয়। একটা ইংরেজি বইয়ে পড়েছি, "Sweet is the remembrance of trouble when you are in safety." আমাদেরও সেই অবস্থা। অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে, "জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন" অবস্থার মধ্যে কাটিয়ে আবার আজ একসঙ্গে বহু পুরাতন বন্ধুরা মিলিত হতে পেরেছি; কাজেই এ আনন্দ যে কতটা উপভোগ্য তা বোধ হয় ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যে উপলব্ধি করতে পারবেন না। আমরা যখন সিঙ্গাপুর ছাড়ি, তখন ডাঃ ইলিয়াস সেখানে ছিলেন। তারপর যখন আমাদের এদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসে, দু'জন ডাক্তার মারা যান ও অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন সিঙ্গাপুর থেকে চারজন ডাক্তার নিয়ে আসা হয় নেতাজীর বিমানে করে। ডাঃ ইলিয়াস তাঁদের মধ্যে একজন। আমরা প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর দল বেঁধে বাইরে বেড়াতে যেতাম কয়েক মাইল দূর পথে। এখানকার দোকানপাট প্রায় বেশীর ভাগই খোলা, কিন্তু জিনিসের দাম অত্যধিক। তবু মাঝে মাঝে রসগোল্লা খাওয়ার লোভ

সংবরণ করতে পারতাম না। একটি মাত্র দোকানে রসগোল্লা তৈরী হতো। এক একটির দাম এক টাকা। অন্যান্য সব জিনিসের দামই বেশ চড়া। ডিম একটি চার টাকা। একটি ব্লেড এক টাকা, এক প্যাকেট সিগারেট বিশ টাকা। আমাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি যে নালা ছিল সেখানে অনেক মাছ ছিল। প্রায়ই দুপুরে গিয়ে কিছু কিছু মাছ ধরে আনতাম।

এইভাবে কিছুদিন কাটার পর শুনলাম, আমাদের পুরো ডিভিসন পিমনা যাবে। কৃষি কলেজ ক্যাম্প শীঘ্রই খালি করে দিতে হবে। আমরা তখন মান্দালয় হিল ক্যাম্পে এসে উপস্থিত হলাম। ঠিক হলো যারা সুস্থ ও সবল, তারা আগে যাবে—পরে রুগীদের নিয়ে ডাক্তাররা যাবে। কাজেই হিল ক্যাম্পে বেশীর ভাগ সৈন্যই অল্প দিনের মধ্যে চলে গেল। আমরা সেখানে একটি বড় গোছের হাসপাতাল স্থাপন করে কাজ করতে লাগলাম।

আমাদের ক্যাম্পের কাছেই একটি বর্মীদের হাসপাতাল ছিল। একদিন বিকালে বেড়াতে যাওয়ার পর দু-একজন ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হলো। তাঁদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার জন্য একদিন সান্ধ্যভোজে তাঁদের চারজনকে নিমন্ত্রণ করি। ভোজ্য বস্তু ছিল অতি সাধারণ। তবে আলাপ-আলোচনা যথেষ্ট হলো। জাতীয়তা থেকে শুরু করে সভ্যতা, বর্তমান যুদ্ধ—কোন কিছুই বাদ পড়লো না। একজন ডাক্তার ছিলেন, তিনি বিমানকে বড় ভয় করেন, কথায় কথায় প্রত্যেকবারই বলছিলেন, যত বড় আলোচনাই করুন, বর্তমান জগতে একমাত্র বাস্তব সত্য হচ্ছে—বিমান ও তা থেকে বোমাবর্ষণ। চানকে সবেমাত্র রবীন্দ্রনাথের 'Nationalism in East and West' শেষ করেছেন; কাজেই কিছুক্ষণ ধরে বেশ খানিকটা বিদ্যার নমুনা দিলেন। নেতাজীকে প্রত্যেক বর্মীই যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। প্রত্যেক শিক্ষিত বর্মীই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধে সহানুভূতি জানায়। কথায় কথায় একজন বলেন, একবার একটি কাগজে ছাপা হয়েছিল নেতাজী রেঙ্গুনে বক্তৃতা দেবেন। ভারতীয় যত ছিল তারা তো উপস্থিত হলোই, তাছাড়াও বহু বর্মী সেখানে উপস্থিত ছিল। একজন বর্মীকে জিজ্ঞাসা করা হলো তিনি এ সভায় কি জন্য উপস্থিত হয়েছেন? তাঁর উত্তর হলো: 'I have come to see the Indian Lion who keeps the whole British nation awake.' অর্থাৎ যে ভারতীয় সিংহ বৃটিশকে সর্বদা সজাগ রাখে আমি তাঁকেই দেখতে এসেছি। এর দ্বারা নেতাজীর প্রতি বর্মীদের মনোভাব প্রকাশ পায়। অবশ্য বর্মীদের সঙ্গে ভারতীয়দের মনোমালিন্যের কথা মাঝে মাঝে শোনা যে না যায়, তা নয়। তবে আমার মনে হয়, সেটা একটু নিম্নস্তরের এবং স্বার্থপর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এইভাবে নানারূপ আলাপ-আলোচনার মধ্যে অনেক রাতে আমাদের আসর ভাঙলো।

আমাদের ক্যাম্পের পাশেই মান্দালয় হিলের উপর খুব বড় প্যাগোডা। অনেক জায়গাতে ছোট ছোট বহু প্যাগোডা যুদ্ধে ধ্বংস হলেও এখানকার প্যাগোডা এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা একদিন উপরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। উপর থেকে মান্দালয় শহরের শোভা খুবই মনোরম। দুর্গের কাছাকাছি আমাদের আর একটি ক্যাম্প আছে, এখানেও একটি হাসপাতাল আছে। সেখানে ক্যাপ্টেন লতিফ ও লেফটেন্যান্ট গাঙ্গুলী তখন কাজ করতেন। সেখানেও মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতাম—আর গাঙ্গুলীর নিজ হাতের তৈরী সন্দেশ খেয়ে আসতাম।

আমাদের এখান থেকে 'পিমনা' যাওয়ার বন্দোবস্ত হয়েছে। ঠিক হয়েছে প্রত্যেক ডাক্তারের সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন করে রুগী, প্রায় পঁচিশজন করে নার্সিং সিপাহী, আর কিছু কিছু ঔষধের বাক্স যাবে। সঙ্গে চাল ডাল সব কিছু থাকবে—রুগীদের রান্না করে খাওয়ানোর দায়িত্ব সবকিছু হবে ডাক্তারের। সঙ্গে কিছু কিছু করে টাকা থাকবে—আবশ্যক মতো পথে রুগীদের জন্য দুধ, ডিম বা ফল কিনে দেওয়ার জন্য।

ডিসেম্বরের শেষদিক। প্রথমদল নিয়ে যাত্রা করলো লেফটেন্যান্ট প্রশারকর। তার দু'দিন পরে আমিও পঞ্চাশজন রুগী ও পঁচিশজন নার্সিং সিপাহী নিয়ে যাত্রা করলাম। কিছুদূরে, প্রায় বারো মাইলের পর এক জায়গাতে পুল ভেঙেছে, কাজেই আপাতত ট্রেন চলাচল বন্ধ। আমরা লরী করে এসে নৌকোতে নদী পার হয়ে রেল স্টেশনের প্রায় এক-

মাইল দূরে একটি গ্রামে আশ্রয় নিলাম। সঙ্গে কয়েকজন ছিল, যাদের সাহায্য ব্যতিরেকে চলা অসম্ভব। পরদিন সন্ধ্যায় স্টেশনে খবর জানলাম, আজ রাতে গাড়ি চলার আশা আছে। গ্রামে গরুর গাড়ি ভাড়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। সঙ্গে কয়েকটি অক্ষম রুগী, তাছাড়া প্রত্যেক দলের সঙ্গে পনের দিনের মতো 'রেশন' ও রান্নার বাসন-কোসন। কাজেই গরুর গাড়ি না পাওয়াতে বড়ই ভাবনায় পড়তে হলো। খবর নিয়ে শুনলাম, কাছাকাছি জাপানীদের লরীর আড্ডা আছে। সেখানে গিয়ে ভাঙা ভাঙা জাপানীতে তাদের বুঝিয়ে দিলাম যে, একটি লরীর বিশেষ দরকার। তারা রাজী হয়ে সন্ধ্যার আগে আমার কাছে দুটি লরী পাঠিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় গাড়ি পেয়ে আমরা তাতে চড়লাম কিন্তু গাড়ি খুব বেশী দূর যেতে পারলো না। অল্প দূরে—মাত্র 'চৌসে' (Kyaukse) পর্যন্ত এসে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লো। আমরাও এখানেই নেমে পড়লাম। স্টেশনগুলির কাছাকাছি থাকা মোটেই নিরাপদ নয়, অথচ এই সমস্ত রুগী ও মালপত্র নিয়ে দূরে যাওয়াও সম্ভবপর নয়। যাই হোক, প্রায় আধ মাইল দূরে একটি জনহীন পল্লীতে আশ্রয় নিলাম। এখানে ক্যাপ্টেন মল্লিকের দলও এসে হাজির হলো। সকালে বাজার থেকে কিছু দুধ ও কমলা লেবু কিনে আনলাম। দুধের চা তৈরী হলো। রুগীদের রান্না করে খাওয়ানো হলো। এখানে আমাদের একটি 'মোটর ইউনিটের' শাখা ছিল। সেখান থেকে আমার দলের জন্য দুটি লরীর বন্দোবস্ত করলাম, একেবারে 'কুমে রোড' পর্যন্ত—এখান থেকে প্রায় বাইশ মাইল দূর। এবার যাতে আমাদের পথে কষ্ট না হয় সেজন্য আগে থেকে বিশ মাইল পঁচিশ মাইল দূরে ক্যাম্পের বন্দোবস্ত হয়েছে। 'কুমে রোডেই' এই রকম একটি ক্যাম্প আছে। স্টেশন থেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে, রাস্তার কাছাকাছি এক বড় পরিত্যক্ত গ্রামে আশ্রয় নিলাম। সকালে দেখি ডাঃ প্রশারকরও এখানে আটকা পড়েছেন। শুনলাম আশপাশের স্টেশনগুলির উপর বোমা বর্ষণ হওয়াতে গাড়ি একেবারে অচল। কাজেই ঠিক কবে নাগাদ যাওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠবে বলা যায় না। এখানকার ক্যাম্পে 'রেশনে'র বন্দোবস্ত ছিল, কাজেই সঙ্গের জিনিস ব্যবহার না করে এখান থেকেই প্রত্যহ 'রেশন' নিতে শুরু করলাম। আমার পরেই ডাঃ মল্লিক তাঁর দল নিয়ে এসে পেঁাছালেন। মল্লিকের দলে বেশীর ভাগই কঠিন রুগী। তারপর এলেন ডাঃ শান্তিস্বরূপ, তারপর ডাঃ বাম। কাজেই প্রায় আড়াইশো রুগী নিয়ে আমরা পাঁচজনে এখানেই একটি অস্থায়ী হাসপাতাল তৈরী করে কাজ করতে লাগলাম।

এখানকার বাজারে যথেষ্ট কমলালেবু পাওয়া যেতো। রুগীদের তাই কিনে খাওয়াতাম। মাঝে মাঝে ভালো কলা ও আনারসও পাওয়া যেতো। এইভাবে কয়েকদিন কাটানোর পর হাতের টাকা ও ঔষধপত্র কমে যেতে লাগলো। পনের দিনের মতো পাথেয় নিয়ে যাত্রা করেছিলাম, কিন্তু পনের দিন তো প্রায় এখানেই কেটে গেল, এখনও কতদিন এখানে কাটাতে হবে বা কতদিনে 'পিমনা' পেঁাছাতে পারবো, তারও কোনও স্থিরতা নেই। ইতিমধ্যে একদিন কর্নেল পি. এন. দত্ত ও কর্নেল শাহ নওয়াজ এখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমাদের দুরবস্থার কথা সব কিছু তাঁদের জানালাম।—পথ খরচের টাকা কর্নেল শাহ নওয়াজ আমাদের দিয়ে গেলেন এবং বলে গেলেন, অবস্থা যেরূপ দেখা যাচ্ছে, যদি ট্রেনে সম্ভবপর না হয় তা হলে যারা সুস্থ আছে তাদের পদব্রজে আর রুগীদের গরুর গাড়ি করে পাঠানোর বন্দোবস্ত করতে হবে। ঔষধের জন্য মান্দালয়ে কর্নেল গোস্বামীকে চিঠি দিলাম। দু'একদিন পরেই ক্যাপ্টেন চানকে কিছু ঔষধ নিয়ে এসে হাজির হলেন। আমাদের এখানকার ক্যাম্প কম্যাণ্ডার গান্ধী রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন সাধু সিং। যুদ্ধে একবার আহত হওয়ার পর বর্তমানে আবার কাজ করছেন। স্টেশনের কাছাকাছি গান্ধী রেজিমেণ্ট রয়েছে। একদিন আমরা ডাঃ দাসের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেখানে পেঁাছলাম। ক্যাপ্টেন সিঙারা সিং কাছাকাছি জঙ্গল থেকে একটি হরিণ শিকার করেছেন, তারই চামড়া তখন ছাড়ানো হচ্ছে। সন্ধ্যার আগেই আমরা ফিরে এলাম। সন্ধ্যার পর সেদিন ক্যাপ্টেন সাধু সিংএর ওখানে গেলাম। হরিণের মাংস এতদূরে পেঁাছে দেওয়ার জন্যই আমাদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ।

কাছাকাছি নালাতে তখন ছোট ছোট কই মাগুর মাছ যথেষ্ট পাওয়া যেতো। আমার

কয়েকজন সিপাহী দুপুরের পরে চলে যেতো, আবার সন্ধ্যার সময় অনেক মাছ ধরে আনতো। এদের মধ্যে অনেকেই মাছ খায় না। কাজেই আমরাই তা শেষ করতাম। একদিন আমি ও চান্‌কে ছিপ নিয়ে মাছ ধরার চেষ্টায় বেরুলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা চেষ্টার পর তিনটি কাঁকড়া ও দু'টি পুঁটি নিয়ে ফিরে আসতে হলো। এইভাবে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহটি কেটে যাওয়ার পর শোনা গেল এবার ট্রেন যাবে। কাজেই প্রথম দলে (লেফটেনাণ্ট) প্রশারকর যাবার জন্য তৈরী হলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর তাদের গাড়িতে তুলে দিয়ে লোক ফিরে এল। গাড়ি ছাড়তে কিছু দেরী আছে। সে রাতে পূর্ণিমার আলো ঝল্‌মল্‌ করছিল। রাত প্রায় এগারটার সময় আমরা শুনতে পেলাম বিমানের আওয়াজ ও সংগে সংগে মেশিনগানের শব্দ। আমাদের ধারণা ছিল গাড়ি চলে গেছে, কাজেই এ আক্রমণটা হচ্ছে স্টেশনের উপর। কিন্তু পরদিন সকালে আমাদের ভ্রম ভাঙলো। ডাঃ প্রশারকর তিনজন আহতকে নিয়ে এসে হাজির করলেন। শুনলাম গাড়িটি সবেমাত্র স্টেশন থেকে বার হয়ে মাত্র মাইলখানেক পথ এসেছে, এমন সময় হঠাৎ দুটি বিমান এসে পড়ল। জায়গাটির পাশে ধানের ক্ষেত, তার উপর পরিষ্কার চাঁদের আলো, কাজেই বেশ তৎপরতার সংগে তারা ট্রেনটি আক্রমণ করে। সকলেই গাড়ি থেকে নেমে চারদিকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে। বহু জাপানী হতাহত হয়। আমাদের মাত্র তিনজনের গুলী লাগে, তবে তাও বিশেষ মারাত্মক হয়নি। পরের দিনও আর গাড়ি যায়নি। এদিকে ক্যাম্পে লোকসংখ্যা বেশী হওয়াতে এবং জায়গাটা স্টেশন থেকে একটু বেশী দূরে হওয়াতে আমিও আমার দল নিয়ে স্টেশনের কাছাকাছি একটি বুদ্ধ-মন্দিরে আশ্রয় নিলাম। সেদিন গাড়িতে 'মেশিনগান' চলার পর আমাদের লোকেরা অনেকেই বেশ ভীত হয়েছে। তারা ট্রেনে করে যাওয়ার চাইতে হেঁটে যাওয়াই বেশী নিরাপদ মনে করলো। সক্ষম লোকেরা হেঁটে গেলে রুগীদের পরিচর্যা করার লোক থাকে না, কাজেই তাদের অনেক করে বোঝালাম। চতুর্থ দিনে আবার ট্রেন পাওয়া গেলে জাপানীরা আমাদের দেড়শো লোক পাঠাতে বললো। কাজেই আমি ও প্রশারকর আমাদের দল নিয়ে হাজির হলাম। দুটি প্যাসেঞ্জার বগী আমরা পেয়েছিলাম। এবার আমি সকলকে অভয় দিলাম। কারণ, এ পর্যন্ত আমি দেখেছি ঠিক আমার উপর আক্রমণ কোথাও হয়নি। ভোরের দিকে আমরা 'তাজি' পেঁছলাম। এত বড় জংশন স্টেশন, কিন্তু স্টেশন-বাড়ির কোন চিহ্নই নেই। স্টেশনের উপরে যে কত বোমা পড়েছে তা গুণে শেষ করা যায় না। বহু কষ্টে জাপানীরা মাত্র একটি লাইন ঠিক করে গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে প্রায় মাইলখানেক দূরে একটি বাজারের পাশে গাছতলাতে আশ্রয় নিলাম। শুনলাম আজ রাতে আর হয়তো যাওয়া সম্ভবপর হবে না। বিকালে গাছতলাতে দাঁড়িয়ে আছি। এক বাঙালী ভদ্রলোকের সংগে দেখা। তিনি রেলে কাজ করেন। পরের দিন দুপুরে তাঁর ওখানে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। বেশ পরিতৃপ্তির সংগে খাওয়া হলো। ভদ্রলোক এখানে একা কাজ করেন। বাপ, মা, স্ত্রী সকলেই 'কালো' থাকেন।

পরের দিন সন্ধ্যায় আবার গাড়িতে উঠলাম। ভোরের আগে আবার নামলাম একটি ছোট স্টেশনের পাশে। গাড়ি থেকে নেমে সকলেই গ্রামের মাঝে, বাগানে ও গাছতলাতে জায়গা নিলো। আমরা কাছাকাছি একটি ফুঙ্গি চৌঙ্গ অধিকার করলাম। সকাল সকাল রান্না করে সকলকে খাওয়ানোর পর মনে হলো, এতগুলি লোক একসংগে থাকা নিরাপদ নয়। কাজেই খাওয়ার পর প্রত্যেককে দূরে দূরে পাঠিয়ে দিলাম। সেখানে রইলাম আমি, প্রশারকর আর মাত্র কয়েকজন। বেলা প্রায় চারটের সময় ছ'খানা বিমান এসে হাজির। প্রথমে তারা রেল লাইনের গাড়িগুলির উপর খুব মেশিনগানের গুলী ছোড়ে। তারপর হঠাৎ দুটি বিমান একেবারে আমাদের মাথার উপর এসে উপস্থিত। একটি মাত্র 'ট্রেঞ্চ' ছিল। সকলে তার ভিতরেই ঢুকে পড়লাম। বিমান দুটি বেশ মনের আনন্দে মন্দিরের উপর গুলী চালালো।

মিনিট দশেক পরে বিমানগুলি চলে যাওয়ার পর আমরা 'ট্রেঞ্চ' থেকে বাইরে এসে দেখি, মন্দিরের অনেক জায়গাতে গুলী লেগেছে। ভিতর থেকে ধোঁয়া উঠছে। মন্দিরে কেউ ছিল না। দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে দেখি, বিছানাতে অল্প অল্প আগুন লেগেছে।

বর্মীরাও ছুটে এল এবং তারাই জিনিসপত্র বার করতে লাগলো। স্টেশনে গাড়িতে আমাদের ঔষধপত্র ছিল। সেখানে লোক ছিল। তাড়াতাড়ি লোক পাঠিয়ে খবর নিলাম—সকলেই নিরাপদে আছে। গাড়িগুলির মধ্যে একটি 'ওয়াগনে' জাপানী মেয়েরা যাচ্ছিল। সেই গাড়িতে আগুন লেগে তাদের কাপড় জামা সব কিছু পুড়ে গেছে। ইঞ্জিনের উপরই বিশেষ করে আক্রমণ হয়। কিন্তু জাপানীরা ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে বেশ চালাক। তারা ভালো ইঞ্জিনখানাকে নীচে ঢাকা দেওয়া জায়গাতে লুকিয়ে রাখে, আর একখানা ভাঙ্গা ইঞ্জিন রেলের উপর দাঁড় করিয়ে রাখে। প্রথম প্রথম তো বৃটিশ ভাঙ্গা ইঞ্জিনের উপর যথেষ্ট গুলী খরচ করতো; পরে দিন হলে খুব নীচে এসে নম্বর দেখতো; কিন্তু রাতের বেলা আন্দাজেই অনর্থক গুলী ছুঁড়তে হতো।

সন্ধ্যায় আবার সদলবলে গাড়িতে চড়ে বসলাম। গাড়ি পিমনা থেকে কিছুদূরে এক জায়গাতে দাঁড়ালো। আমি সকলকে নামিয়ে একটি জঙ্গলে আশ্রয় নিলাম, আর ডাঃ প্রশারকরকে পাঠালাম ক্যাম্পের খোঁজে। প্রথমদিনে ক্যাম্পের সন্ধান নিয়ে প্রশারকর ফিরে এলেন। দ্বিতীয় দিনের সন্ধ্যায় গরুর গাড়ি করে রুগী পাঠানোর বন্দোবস্ত হলো। আমাদের ক্যাম্প পিমনা থেকে প্রায় ন'মাইল দূরে 'ইয়েজিন' নামে ছোট্ট একটি পল্লীতে। পল্লীটির মধ্যে আছে শুধু দু'নম্বর হাসপাতাল—যা 'মনেয়াতে' কাজ করছিল। রেজিমেণ্ট-গুলি আশপাশের জঙ্গলের মধ্যে খড়ের ঘর বেঁধে বাস করছে। রুগীদের সকলকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর আমি আমার রেজিমেণ্টে যোগদান করলাম। ছোট ছোট বাঁশঝাড়ের জঙ্গল, তার মধ্যেই প্রায় তিন মাইল ব্যাপী জায়গাতে আমাদের ছড়ানো ছড়ানো ক্যাম্প। আমি একটি ছোট ঘর পেলাম একা থাকার জন্য।

এখানে আসার পর আবার বেশ কাজ পড়লো। প্রত্যেককে পরীক্ষা করা, তাদের টীকা দেওয়া, ইনজেকসন দেওয়া ইত্যাদি। বিমানাক্রমণের ভয়। এজন্য এক একটি ঘর খুব দূরে দূরে। আমাদের রেজিমেণ্টের হাসপাতাল আমার ঘর থেকে প্রায় এক মাইল দূরে। অন্যান্য অফিসারদের ঘর আবার সেখান থেকেও প্রায় আধ মাইল দূরে, সুতরাং সামান্য কাজের জন্য মাইলের পর মাইল পথ হাঁটতে হতো। তারপর আবার পথ বদল হতো। নিত্য নূতন পথ হতো। কারণ একই পথে কয়েকদিন চলাচল করলে সেখানে সরু রাস্তা হয়ে যায় এবং সে পথ বিমান থেকে বেশ দেখা যায়।

॥ ৮ ॥

এখানে কয়েকদিন থাকার পর একদিন সকালে মেজর রঙ্গচারীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি, হঠাৎ দেখি তাঁর ঘর ভর্তি ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর মেয়েরা। এ'রা সকলেই মেমিও হাসপাতালের নার্স। এ'রা বহুবার নিজেদের জীবন বিপন্ন করেও রুগীদের যেভাবে সেবা করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। একবার মেমিওতে ভীষণভাবে বোমা বর্ষণ হয়। মেয়েরা সবাই ট্রেঞ্চে থাকার জন্য তাদের সকলেরই জীবন রক্ষা পায় কিন্তু তাদের থাকার জায়গার খুব ক্ষতি হয় এবং কাপড়-জামা সবই পুড়ে যায়। নার্সিং বিভাগের মেয়েদের কম্যাণ্ডার ছিলেন লেঃ মিসেস চ্যাটার্জি। তিনি ও তাঁর স্বামী উভয়েই মালয়ের সিভিলিয়ান ছিলেন। উভয়ে একই সাথে আই. এন. এ-তে যোগদান করেন। স্বামী স্বাধীনতার যুদ্ধে মারা যাওয়ার পরও তিনি এই নিদারুণ শোক সহ্য করেও যেভাবে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, তাতে সকলেই খুব আশ্চর্য হন। নেতাজী স্বয়ং তাঁর কাজের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন, তাঁকে লেফটেনাণ্ট-এর পদে উন্নীত করে তাঁর কাজের যোগ্য সম্মান প্রদান করেছেন। মিসেস চ্যাটার্জিই হচ্ছেন নার্সিং বিভাগের একমাত্র লেফটেনাণ্ট। তাঁর এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য মেয়েরাও যথেষ্ট যোগ্যতা দেখিয়েছেন। এরা নিজেদের বীরত্ব, সেবা ও কষ্টসহিষ্ণুতা দ্বারা এবং অসীম ক্ষমতা দেখিয়ে নিজেদের রেজিমেণ্টের মুখোজ্জ্বল করেছেন। নির্ভীক বীর রমণী—ঝাঁসির রাণীর পদাঙ্ক এ'রাই

প্রকৃতভাবে অনুসরণ করেছেন। স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাসে—বীর সৈনিকগণের নামের পাশে এই রমণীদের নামও চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

আপাতত এঁরা রেঙ্গুন যাচ্ছেন। এখানে প্রথম মেজর লক্ষ্মী স্বামীনাথনের সঙ্গে আলাপ হয়। পরিচয়টা করিয়ে দেন মেজর রঙ্গচারী। মেজর লক্ষ্মীর নামের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় থাকলেও এপর্যন্ত সাক্ষাৎ করার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। বেশ খানিকক্ষণ গল্প হলো। সকলে চা-পান করার পর বিদায় নিলাম।

ঔষধপত্র আমাদের কমে আসছিল। নূতন কিছু পাওয়া যাবে না; কাজেই বেশ কৃপণের মতোই ঔষধ ব্যবহার করতাম। আমাদের একজন মারাঠী ডাক্তার—ক্যাপ্টেন বাম—গাছগাছড়া যোগাড় করতেন। 'ক্যালেগুলা' গাছের রস দিয়ে যে ঔষধ হতো, তা ঘায়ে ব্যবহার করে বেশ সুফল পাওয়া যেতো। আমাদের মেজর মিশ্রও নানা গাছগাছড়া নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন।

এখানে বীরেন রায় প্রভৃতি সকলেই এসে জমেছেন। একদিন মেজর হাসান বললেন, 'এখান থেকে প্রায় চার মাইল দূরে একটি গ্রামে একটি বিপন্ন বাঙালী পরিবার আছে, যদি তোমাদের দ্বারা সম্ভব হয় কিছু সাহায্য করো।' আমি ও বীরেন রায় একদিন দুপুরে খাওয়ার পর গ্রামের সন্ধানে বেরুলাম। লোকে ভুল করে চিটাগং বস্তী বললেও প্রকৃতপক্ষে গ্রামের নাম চিটঙ্গ-গা। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাদের সন্ধান পেলাম। একটি বিধবা স্ত্রীলোক, একটি মেয়ে ও দুটি ছেলে। স্বামীটি মাত্র একমাস হয় মারা গেছেন। স্ত্রী রক্তহীনতা ও ম্যালেরিয়াতে একেবারে শয্যাশায়ী। একটি ছেলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে একেবারেই পঙ্গু। তারা সকলেই একটি বর্মীর বাড়িতে পড়ে আছে। আমরা তাদের সব খোঁজখবর নিলাম। স্বামীটি এখানকার পোস্টমাস্টার ছিলেন। বৃটিশ যখন বর্মা ছেড়ে যায়, তখন এঁরাও মাচিনা পর্যন্ত যান; কিন্তু সেখান থেকে ভারতবর্ষে আসার কোনও সুবিধা করতে পারেননি। ইতিমধ্যে জাপানীরা মাচিনা অধিকার করে। তখন আবার এইখানেই ফিরে আসেন। এখানে আসার পর স্ত্রীটি রসগোল্লা সন্দেশ তৈরী করতেন, স্বামীটি তাই বিক্রয় করে সংসার চালাতেন। তারপর ম্যালেরিয়া হওয়াতে মাসখানেক আগে মারা গিয়েছেন; হাতে পয়সাকড়িও বিশেষ কিছু নেই। এই দূর বিদেশে—আত্মীয়স্বজনবিহীন অবস্থায় এমনিভাবে বর্মীদের বাড়িতে পড়ে থাকা যে কতটা কষ্টকর, তা আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম। ঔষধ এবং টাকাকড়ি দিয়ে যতটা সম্ভব সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিলাম। ক্যাম্পে ফিরে আসার পর অন্যান্য অফিসারদের এঁদের কথা বলতেই তাঁরা সকলেই কিছু কিছু করে টাকা দিলেন। আমরা মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে দেখাশোনা করতে লাগলাম। প্রথমে বর্মীরা তাঁদের বিশেষ যত্ন নিতো না, কিন্তু আমাদের ঘন ঘন যাতায়াত করতে দেখে, কতকটা ভয়েই, একটু দেখাশোনা করতো। বিশেষ চেষ্টায় রুগী দুটির স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি হয়, কিন্তু এখনও কিছুদিন পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ আবশ্যক। আমরা আমাদের হাত-খরচ বাঁচিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করতে লাগলাম।

যুদ্ধে যে জাপানীদের অবস্থা খুব খারাপ হবে, এমন আশঙ্কা আমরা করতে পারিনি। কিন্তু পরে দেখা গেল, তারা বৃটিশের আক্রমণের বেগ সহ্য করতে পারছে না। প্রথম প্রথম তো জাপানীরা 'কালেওয়া'র রাস্তা একেবারে ছেড়ে দেয়—পরে বৃটিশ মান্দালয়ের উপর আক্রমণ করে। বৃটিশের অগণিত বিমান, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের তুলনায় জাপানীদের একেবারে নিরস্ত্র বলা চলে। বিশেষ করে বর্মার দিকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপানীরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছে। সামান্য একটি গ্রাম অধিকার করতেও বৃটিশকে যে রকম সাড়ম্বরে আক্রমণ করতে হয়েছে, তাতে সব কিছু অপচয় ছাড়া আর কিছুই হয়নি। বৃটিশের অগ্রগতি সাধারণত এইভাবের—প্রথমে উপর থেকে বিমানগুলি রাস্তার দু'পাশের গ্রামগুলিতে বোমাবর্ষণ করে ও মেশিনগান চালিয়ে একেবারে ভস্মস্তূপে পরিণত করে। তারপর যা বাকী থাকে, ট্যাঙ্কের আক্রমণে তাও শেষ হয়ে যায়। সকলের পিছনে লরীতে বিমানের আওতার নীচে পদাতিক সৈন্যরা আসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে জাপানীরা বেশ জোরালো বাধা দিয়েছে। মান্দালয়ের যুদ্ধ এর একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যারা সকলের শেষে

মান্দালয় থেকে এসেছে, তাদের কাছে শুনলাম শহর একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বৃটিশ আসার আগে একদিন বহু বিমান এসে শহরের প্রায় প্রত্যেক জায়গাতে ভীষণভাবে বোমাবর্ষণ করে। এমন কি পুরনো দুর্গটিও মাটিতে মিশে গেছে। 'মান্দালয় হিলের' উপরকার সুন্দর প্যাগোডাগুলি এবার বৃটিশের কামানের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। জাপানীদের কাছে বিশেষ কিছু না থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ নির্বিবাদে শহর অধিকার করতে পারেনি। মান্দালয়ে জাপানীরা শেষ পর্যন্ত বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছে। যখন তাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই ছিল না—তখন তারা কুলির মতো হলদে কাপড় পরে হঠাৎ হাতবোমা নিয়ে শত্রুদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তো। মান্দালয়ের যুদ্ধে যে জাপানীরা বিশেষভাবে বাধা দিয়েছে একথা বৃটিশও স্বীকার করেছে। মান্দালয়ের পতন হওয়ার পর আমরা বিশেষ ভাবনায় পড়লাম—এবার হয়তো জাপানীদের বর্মা ছাড়তে হবে। বৃটিশ সোজা রেললাইন ও পথ অধিকার করলেও ইরাবতী নদীর দু'পাশে তখনও বহু জাপানী সেনা গেরিলা যুদ্ধ করছে। অনেকে নদী ও রাস্তা পার হয়ে সান স্টেটের পাহাড়ে ঢোকার চেষ্টা করছে।

আমাদের দু'নম্বর ডিভিসন তখন 'মিনজান' ও 'পোকোকু'র দিকে অগ্রগমনে বাধা দেওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে। আমাদের চার নম্বর অর্থাৎ নেহরু রেজিমেণ্ট তখন মিনজানে —আর পাঁচ নম্বর ও অন্যান্যরা তখন পোকোকুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। দু'নম্বর ডিভিসনের কম্যাণ্ডার কর্নেল আজিজ অসুস্থ হওয়াতে তখন একনম্বর সুভাষ রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার কর্নেল শাহ নওয়াজ দু'নম্বর ডিভিসনের কম্যাণ্ডার নিয়োজিত হন।

অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকেই যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে একদিন সকালে উঠে দেখি ক্যাম্পের প্রহরীর সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে। বুঝতে দেরী হলো না যে, নেতাজী এসেছেন। তখন 'মিনজানে'র দিকে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সঙ্গে বৃটিশের যুদ্ধ হচ্ছে। চারিদিকে নানা রকম গুজব চলছিল। কেউ বলছিল, আমাদের সৈন্যরা বিনাযুদ্ধে পথ ছেড়ে দিয়েছে। কেউ বলছিল—তাদের অনেকে বিপক্ষে যোগ দিয়েছে। একদিন রাতে আমবাগানে নেতাজীর বক্তৃতা হলো। প্রথমে তিনি শুরু করলেন, 'ইউরোপের অবস্থা খারাপ হলেও তার জন্যে আমাদের বিশেষ চিন্তার কোনও কারণ নেই, আমাদের এশিয়া নিয়ে কথা। প্রথমে জানাতে চাই, আমাদের নেহরু বাহিনীর যুদ্ধের কথা। আমি নিজেও শুনেছি তারা নাকি সকলে ঠিক মতো যুদ্ধ করেনি। কিন্তু পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি একথা একেবারেই মিথ্যা। আমাদের সৈন্যরা সেখানে যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। দু'জায়গাতে বৃটিশ চেষ্টা করেও আমাদের সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করতে পারেনি। পরে তারা যেখান দিয়ে অগ্রসর হয় সে স্থানটি জাপানীরা রক্ষা করেছিল। পালিয়ে যাওয়ার কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। যুদ্ধের সময় একটি কোম্পানী একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং শত্রুরা তাদের ঘেরাও করে। তারা এখনও যুদ্ধ করছে। বর্তমানের এ অবস্থা দেখে আমাদের হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। মানুষ মাত্রেরই মৃত্যু আছে। শুধু এই বর্মা থেকেই পিছনে পালাবার সময় পাঁচ লক্ষ ভারতীয়ের মধ্যে চার লক্ষ ভারতীয় পথেই মারা গিয়েছে। তাদের মৃত্যুতে দেশের কোনও উপকার হয়নি। কিন্তু এরা যদি এমন অসহায়ভাবে মৃত্যু-বরণ না করে দেশের জন্য প্রাণ দিতো তবে বোধ হয় আজ ভারত পরাধীন থাকতো না। শত্রু আমাদের অবস্থানের খবর লওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে—কাজেই জঙ্গলের মধ্যেও আমাদের খুব সাবধানতার সঙ্গে চলতে হবে। এবার থেকে জঙ্গলে আর সমবেতভাবে সঙ্গীত বা কোন প্রকার ধ্বনি করা হবে না। সেইজন্যই এসো, আজ শেষবার আমরা সকলে সমবেত কণ্ঠে বলি—"চলো দিল্লী, চলো দিল্লী, জয় হিন্দ!"—আমরাও সমবেত ভাবে তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে উঠলাম, "চলো দিল্লী, জয় হিন্দ!" সমস্ত জঙ্গল ভেদ করে তার প্রতিধ্বনি উঠলো—"চলো দিল্লী, জয় হিন্দ!" তাঁর বক্তৃতা প্রায় দুই ঘণ্টা চলেছিল। গম্ভীর উদাত্ত স্বরে যখন তিনি শোনাচ্ছিলেন প্রত্যেকটি ঘটনার কথা, তখন সমবেত সমস্ত সৈন্যরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। মাঝে মাঝে শুধু ধ্বনি হচ্ছিল, "নেতাজী জিন্দাবাদ!" অন্ধকার আমবাগানে শুধু কণ্ঠের স্বরই কানে আসছিল। বক্তৃতা তিনি দিলেন হিন্দুস্থানীতে,

আর একজন তামিল অফিসার তা তামিল ভাষায় তর্জমা করছিলেন। সকলেই তাঁর বক্তৃতা আলোচনা করতে করতে ফিরে এল।

পরদিন সকালে তিনি হাসপাতাল পরিদর্শন করতে এলেন। ক্যাপ্টেন বামের ক্যালে-গুলা অনেক রুগীই ব্যবহার করছে। বামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ফল কেমন হচ্ছে! তিনি উত্তর দিলেন, 'রুগীদের জিজ্ঞাসা করুন।' সারা হাসপাতাল পরিদর্শন করে প্রায় দুপুরের দিকে তিনি জঙ্গলের মধ্যে যেখানে কর্নেল ঠাকুর সিং থাকতেন সেই আমবাগানের কুটিরে ফিরে গেলেন। মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি 'কালো' গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি 'মির্টাকিলার' উপর দিয়ে ফিরে আসার পরই বৃটিশ 'মির্টাকিলাতে' ভীষণভাবে কামান দাগতে শুরু করে। দু'তিন দিন এখানে অপেক্ষা করার পর তিনি রেঙ্গুন যাত্রা করেন। তিনি চলে যাওয়ার পর এখানে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হলো। শোনা গেল এখানে প্রথম ডিভিসনের যারা সক্ষম সৈন্য ও অফিসার আছেন তাদের নিয়ে একটি রেজিমেণ্ট গঠন করা হবে। আপাতত তার নাম হবে 'X' রেজিমেণ্ট। তিনি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রথমে অফিসার নির্বাচিত হলেন। তারপর তাঁরা নিজেদের পরিচিত সৈন্যদের বেছে বেছে নিতে লাগলেন। আমার রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার কর্নেল গুলজারা সিং হেড কোয়ার্টারে বদলি হন। আমাদের বর্তমান কম্যাণ্ডার কর্নেল ঠাকুর সিং 'X' রেজিমেন্টের কম্যাণ্ডার নির্বাচিত হন। ডাক্তার হিসাবে নির্বাচিত হন মেজর এস. পি. মিশ্র। তিনি তাঁর সহকারী হিসাবে তিনজন ডাক্তার নির্বাচন করেন—ক্যাপ্টেন চান্‌কে, লেঃ রাও ও লেঃ প্রশারকরকে। আমার তখনও মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছিল, কাজেই আমাকে বাদ পড়তে হলো। গান্ধী রেজিমেন্টের বীরেন রায় ও কানাই দাসও বাদ পড়লেন। কাজেই তাঁদের ঠাট্টা করে বললাম, 'তোমরা হচ্ছ মারাঠী, যোদ্ধার জাত। আমরা বাঙ্গালী, বৃটিশের মতে যোদ্ধার কোনও গুণ আমাদের নেই। কাজেই এগিয়ে যাও বন্ধু, আমরা তোমাদের জানাচ্ছি অন্তরের শুভেচ্ছা, জয় হিন্দ।' শুনলাম শুধু 'X' রেজিমেণ্ট এখানে থাকবে, অন্যান্যরা পিছু হটে 'জিয়াওয়াদী' যাবে। এবারও আগের মতো প্রত্যেক ডাক্তারকেও কিছু কিছু রোগী সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। এবার সঙ্গে যাবে শুধু নিজের নিজের রেজিমেন্টের রুগীরা।

এদিকে এই বিপন্ন পরিবারটিকে এখানে একা রেখে যেতে আমাদের মোটেই ইচ্ছা নয়। তাঁদের রেঙ্গুনে পাঠাতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত। সেই কথা তাঁদের জানালে বললেন, 'আপনারা যা ভালো বোঝেন তাই করুন।' তখন তাঁদের রেঙ্গুনে পাঠানোই স্থির করলাম। কারণ, সেখানে এমন পরিবারদের সাহায্য করবার জন্যে কয়েকটি আশ্রমের মতো স্থান আছে। তা ছাড়া লীগ আছে—সাহায্যের অভাব হবে না। আমরা এখান থেকে চলে গেলে দেখবার কেউ থাকবে না। তাঁদের পাঠাবার প্রায় সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। হঠাৎ অবস্থার পরিবর্তন। বৃটিশ 'মির্টাকিলা' এসে পে'ৗচেছে—এখান থেকে মাত্র নব্বই মাইল দূর। কাজেই আমাদের তাড়াতাড়ি পিছনে যাওয়ার বন্দোবস্ত শুরু হলো। তখন কর্নেল গোস্বামী বললেন, 'সতোন, তুমিই এ'দের সঙ্গে করে নিয়ে যাও। এ'ছাড়া তো অন্য উপায় দেখছি না।' তখন এক নম্বর ডিভিসন কম্যাণ্ডার কর্নেল আরসাদ—তিনিও আমাকে এ'দের সঙ্গে নিয়ে যেতে অনুমতি দিলেন।

আমি দশখানা গরুর গাড়িতে প্রায় চল্লিশ জন রুগীকে নিয়ে এবং সঙ্গে এ'দের নিয়ে আবার পিছু হটতে শুরু করলাম। প্রথম রাতে প্রায় বার মাইল দূরে, পিম্‌নার কাছাকাছি একটি গ্রামে আশ্রয় নিলাম। তখন পিম্‌নার উপর খুব ভীষণভাবে বিমান আক্রমণ হচ্ছে। প্রত্যহ তিন-চারবার করে প্রায় বিশ-প'চিশখানা বিমান এসে বোমার পর বোমা বর্ষণ করে যাচ্ছে। মিলিটারী এখানে বিশেষ ছিল না। ছিল শুধু একটি ছোট গোছের জাপানী 'এরোড্রোম'। সন্ধ্যার পর আবার আমাদের গরুর গাড়ি সারি বে'ধে চলতে শুরু করলো। রাতেও পথের উপর ঘন ঘন বিমান ঘুরছে মোটরের আলোর সন্ধানে। আমাদের গরুর গাড়ি অন্ধকারে ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ করতে করতে নির্ভয়ে ধীর মন্থর গতিতে চলেছে। প্রায় আট মাইল আসার পর, আমরা 'সিটং' নদীর তীরে একটি ছোট পল্লীতে এসে হাজির

হলাম। এবার এখান থেকে বন্দোবস্ত করা হচ্ছে একেবারে নদীপথে 'জিয়াওয়াদী' যাওয়ার। গরুর গাড়িতে যাওয়ার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে—একদল গাড়ি মাত্র একটি রাতের পথ চলবে। তারপর তারা ফিরে যাবে। আবার নূতন জায়গাতে গরুর গাড়ির বন্দোবস্ত করতে হবে। সব সময়ে সব পল্লীতে দরকার মতো গাড়ি পাওয়া যায় না। তারপর গরুর গাড়ি শুধু আমাদের দরকার নয়, জাপানীদেরও দরকার। এই গ্রামে অনেক আখের ক্ষেত। প্রথম দিনে খুব খানিকটা আখের রস খাওয়া হলো। এখানকার ক্যাম্পে কম্যান্ডার লেঃ শর্মা আমাদেরই এক ডাক্তার বন্ধু।

পরদিন সন্ধ্যায় আমাদের জন্য পাঁচখানা নৌকা ঠিক করা হলো। তার মধ্যে দুটি বেশ বড় ছই দেওয়া; অন্যগুলি ছোট ছোট এবং খোলা। একটি ছই দেওয়া নৌকার মধ্যে সেই বাঙালী পরিবারটি, আমি একজন রুগ্ন অফিসার ও আমাদের আরদালী। আর ছিল ঔষধের বাক্সগুলি। অন্যান্য নৌকায় সকলকে ভাগ করে দিলাম। আর সব নৌকা আগে ছাড়তে বললাম, তারপর সকলের শেষে আমাদের নৌকা ছাড়লাম। তখন সিটং নদীতে জল খুব বেশী ছিল না, তার উপর জলের মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ পড়ে পথ আটকে দিয়েছে। দিনের বেলা নৌকা চালানো মোটেই নিরাপদ নয়, রাতের অন্ধকারে চালানোও মুস্কিল। তার উপর গ্রামের সর্দার এদের নৌকাগুলো ধরাতে মাঝি-মাল্লারাও বিশেষ সন্তুষ্ট নয়। গভর্ণমেণ্টের রেট হচ্ছে মাইল প্রতি দু' টাকা, অথচ মালপত্র নিয়ে ব্যবসা করলে এরা সহজেই হাজার হাজার টাকা লাভ করতে পারে। আমি বর্মীভাষা জানি না, কিন্তু ছোট ছেলে গৌরাঙ্গ খুব সুন্দর বর্মী জানে। সেই আমাকে বললো, এরা অনেক কিছু কথা বলাবলি করছে।

প্রথম রাত্রি, আস্তে আস্তে খানিকটা এগুলাম। প্রথম রাতে প্রায় এগারোটা পর্যন্ত নৌকা চালানোর পর মাঝিরা আর চালাতে রাজী হলো না। তখন আমরা তীরে নেমে বালির উপর কম্বল বিছিয়ে আরামে ঘুমালাম। আবার ভোরের আগে মাঝিদের ডেকে নৌকা ছাড়লাম। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা নদীতীরের একটি গ্রামের কাছাকাছি নৌকা বাঁধলাম। সারাদিন সেই গ্রামেই কাটলো।

এইভাবে খুব আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম। এত ধীরে ধীরে গেলে পুরো এক মাসেও গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সন্ধ্যার পর মাত্র দু' ঘণ্টা ও ভোরে দু' ঘণ্টা —এইভাবেই মাঝিরা নৌকা চালাতে লাগলো। আমি তাদের দিনের বেলাও নৌকা চালাতে বললাম। প্রথমটা তারা রাজী হতে চাইলে না। কিন্তু আমি খুব জবরদস্তি করাতে রাজী হলো। আমরা আমাদের খাকি পোশাক খুলে ফেলে, শুধু লুঙ্গি পরে বাইরে বসতাম। তৃতীয় দিনে আর তিনখানা নৌকা পিছনে পড়ে। আমাদের শুধু দু'খানা নৌকা, তাও প্রায় দূরে দূরে। সকাল প্রায় এগারোটা পর্যন্ত নৌকা চালানো হতো। তারপর নদীর তীরেই কোনও পল্লীতে নেমে রান্না-খাওয়া সেরে প্রায় চারটে পর্যন্ত বিশ্রাম করতাম। আবার রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত নৌকা চালানো হতো। তারপর নেমে রান্না-খাওয়া সেরে ঘুম। সিটং নদীতে খুব মাছ, কাজেই প্রায় রোজই মাছ কিনতে পেতাম। একদিন সন্ধ্যার পর আমার পিছনের নৌকাতে বেশ একটা কলরব শোনা গেল। ভাবলাম কেউ হয়তো জলে পড়ে গেছে। নৌকা থামিয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করলাম। অল্প পরে শুনলাম, তাদের নৌকাতে একটি বড় মাছ উঠেছে। কাছে আসতে দেখলাম সত্যই একটি সের পাঁচেক ওজনের মাছ—যেন জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়েই নৌকাতে উঠেছে আত্মহত্যার জন্য। বলা বাহুল্য, পরদিন সকালে আমরা সকলে পরম তৃপ্তির সঙ্গে মাছটির সদ্গতি করলাম। নদীর উপর দিয়ে ঘন ঘন অনেক বিমান যাতায়াত করলেও আমাদের নৌকাতে কোন আক্রমণ হয়নি। এইভাবে চলতে চলতে সাতদিনে 'টাঙ্গু' এসে পৌঁছলাম। এখানে নদীর উপর একটি পুল আছে। দিনের বেলা বৃটিশেরা বোমাবর্ষণে সেটিকে ভেঙ্গে দিয়ে যায়। জাপানীরা আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে সেটি কাজ চালানোর উপযুক্ত করে সারিয়ে নেয়। আমরা পুল থেকে মাইল খানেক দূরে নদীর তীরে ছোট্ট একটি গ্রামে আশ্রয় নিলাম। আমি এখানে একদিন থাকার বন্দোবস্ত করলাম দুটি কারণে—প্রথমত, আমাদের সঙ্গে যা রেশন ছিল, প্রায় ফুরিয়ে

এসেছে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের তিনখানা নৌকা এখনও পিছনে। তাদের জন্য অপেক্ষা করে এখান থেকে একসঙ্গে যাবার ইচ্ছা। আমাদের মাঝিদের বাড়ি এখানে; কাজেই প্রথমটা তারা এখান থেকে আর আগে যেতে রাজী হলো না। পরে তাদের অনেক বুঝিয়ে রাজী করানো গেল। তারা বাড়ি চলে গেল—কথা রইলো—পরদিন সন্ধ্যায় এসে আমাদের নিয়ে যাবে। অবশ্য নৌকা দুটি আমাদের কাছেই আটকে রাখলাম।

পরের দিন সকালে এখানে জাপানী হেড কোয়ার্টারে গিয়ে আমাদের পঞ্চাশজন লোকের জন্য তিন দিনের মতো রেশন নিয়ে এলাম। সারা দিনে পুলের উপর তিন-চারবার বিমানাক্রমণ দেখলাম। পুলের কাছাকাছি কেউ থাকে না; কাজেই ক্ষতিটা হলো শুধু পুলের। সন্ধ্যার পর থেকে একজনকে নদীতীরে পাহারা দিতে দাঁড় করালাম। উদ্দেশ্য, আমাদের নৌকা যেতে দেখলে ডেকে থামাবে। কিন্তু সারা রাত পাহারা দিয়েও আমাদের কোন নৌকা আসতে দেখা গেল না।

আমার পক্ষে আর বেশী অপেক্ষা করা সম্ভবপর নয়। কাজেই আজ সন্ধ্যাতেই এখান থেকে চলে যাবার জন্য তৈরী হলাম। কিন্তু সন্ধ্যার আগে যে মাঝিদের ফিরে আসার কথা ছিল, তারা এল না। মহা বিপদে পড়লাম। আমার সিপাহীদের মধ্যে দু'জন নৌকা চালাতে জানতো। একটা নৌকা তারা চালাতে পারবে, কিন্তু অন্যটির জন্য দু'জন মাঝির দরকার। গ্রামের সর্দারকে ডেকে সব বললাম, কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ফল হলো না। তখন বাধ্য হয়েই একটু বলপ্রয়োগের পথ ধরতে হলো। সিপাহীদের নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে দিলাম—নীচের দিকে যে-কোন খালি নৌকা যেতে দেখবে, তক্ষুনি আটকাবে। ভালো কথায় কাজ না হলে বলপ্রয়োগও যেন তারা করে।

একটি নৌকা ধরা হলো। আমাদের পেঁছে দিতে বললাম। প্রথমে রাজী হতে চাইলে না। তখন বললাম, আমাদের নৌকার মাঝি পালিয়ে গেছে—তোমরা আমাদের জিয়াওয়াদী পর্যন্ত পেঁছে দিলে তোমাদের ন্যায্য ভাড়া তো দেবোই, তার উপর এই নৌকাখানাও তোমাদের দেবো। তারা তখন রাজী হলো। তাদের নৌকাখানা গ্রামের সর্দারের জিম্মায় রেখে দিয়ে আমাদের নৌকা নিয়ে সন্ধ্যার পরই আমরা আবার রওনা হলাম। প্রথম রাতে খুব বেশী দূর এগুতে পারিনি। কাজেই পরদিন দিনের বেলায় নৌকা চালালাম। তৃতীয় দিনে জিয়াওয়াদী থেকে প্রায় আট মাইল দূরে নদীতীরে একটি গ্রামে উপস্থিত হলাম। এখানে মাঝিদের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমরা পাঁচজন লোককে পাহারা রেখে দিলাম পিছনের নৌকার জন্য। গ্রামের সর্দারকে ডেকে চারখানা গরুর গাড়ি ভাড়া করে আমরা রওনা হলাম। প্রায় তিন মাইল পরেই একটি হিন্দুস্থানী গ্রাম। সেখানে আমাদের সবকিছু বন্দোবস্ত করার জন্য লীগের কতকগুলি লোক ছিল। কাজেই গরুর গাড়িগুলি বিদায় করে—দিনের মতো আমরা এই গাছতলাতে বিশ্রাম করলাম।

সন্ধ্যার পর এখান থেকে গরুর গাড়ি করে রামনগর বস্তিতে উপস্থিত হই। এই গ্রামে আমাদের এখানকার হাসপাতালের একটি শাখা আছে। এখানকার ডাক্তার ক্যাপ্টেন হেম মুখার্জি। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমার সাথী রুগী কয়েকটিকে হাসপাতালে ভর্তি করলাম। বাঙালী পরিবারটিকে আপাতত একটি হিন্দুস্থানীর বাড়িতে রাখা হলো। পরদিন সকালে 'তিওয়ারী চকে' মেজর চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে এই পরিবারটি আপাতত কোথায় থাকতে পারে, সেই পরামর্শ করলাম। দুপুরে তাঁর ওখানেই খাওয়া ও বিশ্রাম শেষ করে এখানকার একজন বাঙালী ডাক্তার বড়ুয়ার বাড়ি গেলাম। তিনি এখানে সপরিবারে থাকেন, তবে তাঁদের সন্তানাদি কিছু হয়নি। তিনি এই পরিবারটিকে নিজের বাড়িতে রাখতে রাজী হলেন। সেইদিনই সন্ধ্যায় তাঁদের এই বাড়িতে রেখে যাই। তার পরদিন আমি আমার রেজিমেন্টের সঙ্গে যোগ দেই। বর্তমানে আমাদের রেজিমেন্ট শুধু নামেই। যখন আমরা ফ্রন্টে যাত্রা করি, তখন আমার রেজিমেন্টের সবসুদ্ধ সৈন্যসংখ্যা দু'হাজার। তারপর যখন ফ্রন্টে পেঁছাই তখন অনেকেই অসুস্থ হওয়ায় আমরা সংখ্যায় ছিলাম প্রায় তেরশ'। তারপর যখন ফিরে এলাম, তখন মাত্র চারশো। তারপর অনেকে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ছ'শো। তারপর সুস্থ-সমর্থেরা

'X' রেজিমেণ্টে যোগ দেওয়াতে এখন আমাদের এখানে প্রায় তিনশো জন আছে।

॥ ৯ ॥

জিয়াওয়াদীর অধিবাসী সকলেই ভারতীয়। এ জায়গাটা হচ্ছে ডুমরাও মহারাজের জায়গা। এখানে একটি বড় চিনির কল আছে। প্রায় আট-দশ মাইল জায়গা জুড়ে অনেকগুলি ছোট ছোট বস্তি আছে। অধিবাসী প্রায় সকলেই আরা জেলার লোক। প্রায় সকলেই গরীব। চাষ-আবাদ করে। দেশ থেকে নানাপ্রকার লোভ দেখিয়ে তাদের আনার পর তাদের কোনরূপ সুবিধা দেওয়া হয় না। কাজেই তারা দেশে যেমন জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হতো, এখানেও তাই হচ্ছে। এখানে এসে বসবাস শুরু করার পর দেশে যাওয়ার সুযোগ বিশেষ ঘটে না। অনেকেই আছে যাদের জন্ম এখানেই, আর যারা এ পর্যন্ত দেশের মুখও দেখেনি। প্রথম প্রথম বিবাহ ও অন্য কাজে এরা দেশে যেতো, কিন্তু এখন এখানে লোক-সংখ্যা এত বেশী হয়েছে যে, এখন আর দেশে যাবার দরকার হয় না। বর্তমানে পুরো জায়গাটি 'জয় হিন্দের' জমি নামে বিখ্যাত। তার কারণ, শোনা যায়, এ-জমি সবই আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে দান করা হয়েছে। এখানকার বস্তিগুলির নাম বেশীর ভাগই ভারতীয় —যেমন রূপসাগর, গাদুগড়, হস্তিনাপুর, জয়নগর প্রভৃতি। আমি চিনির কল থেকে প্রায় দু' মাইল দূরে চকোইন নামে একটি বস্তিতে আমার ঔষধপত্র নিয়ে থাকতাম।

আমরা এখানে আসার প্রায় একমাস আগে এখানকার চিনির কলের কাছাকাছি বোমা পড়ে। তাতে মিলের কিছু ক্ষতি হওয়াতে এখন মিল বন্ধ। মিলের জন্য এখানকার সব জমিতেই আখ লাগানো হয়। এবার মিল বন্ধ হওয়াতে চাষীরা নিজেরাই আখের রস বার করে তাই জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরী করছে। প্রত্যেক গ্রামেই দিনরাত আখ মাড়াই কল চলছে ও গুড় তৈরী হচ্ছে।

মেমিওতে যে হাসপাতালটি কাজ করেছে, এখানেও সেই হাসপাতালটি কাজ করছে। এই হাসপাতালের কম্যাণ্ডিং মেজর খান। গাদুগড়ে সব চেয়ে বেশি রুগী রাখার ব্যবস্থা আছে। তা'ছাড়া রামনগর তেওয়ারীচকের দুটি শাখাতেও প্রায় চার পাঁচশো রুগী রাখার বন্দোবস্ত হয়েছে। সবসুদ্ধ এখানকার হাসপাতালে প্রায় এক হাজার রুগী। তা ছাড়া যারা রেজিমেণ্টে আছে তাদের মধ্যেও অনেকেই বড় দুর্বল।

একদিন গাদুগড় হাসপাতালে বেড়াতে যাই। আমরা যখন ফ্রণ্টে যাই, মেজর খান অসুস্থ হয়ে রেঙ্গুনেই থাকেন। অনেকদিন পরে তাঁর সঙ্গে দেখা। আমরা যখন মান্দালয়ে তখন ক্যাপ্টেন মল্লিক রেঙ্গুনে বদলি হন। এখানে এসে দেখি, আবার এখানকার হাসপাতালে সার্জন হয়ে এসেছেন। এখানে এসে রেঙ্গুনের অনেক গল্প শোনা গেল।

জানুয়ারী মাসের তেইশ তারিখে রেঙ্গুনে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে নেতাজীর জন্মোৎসব হয়। সেদিন রেঙ্গুনের সমুদয় ভারতীয় নেতাজীকে সোনা ও রুপা দিয়ে ওজন করে। এই যুদ্ধের বাজারে প্রায় দু'শো বিশ পাউণ্ড সোনারূপা দান বড় সামান্য কথা নয়। তারপর রেঙ্গুনের ভারতীয় অধিবাসী, যাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ, প্রত্যেকে মাথা-পিছু একগজ করে খদ্দরের কাপড় দান করে। তারপর তাঁর জন্মোৎসব উপলক্ষে 'বাহাদুর শাহ স্কোয়াড' নামে একটি ছোট্ট বাহিনী তৈরী হয়। এই ছোট্ট বাহিনীটির অন্য নাম হচ্ছে 'আত্মহত্যা বাহিনী'। জাপানীদের সেনাবাহিনীতে যেমন 'কামে কাজে' অর্থাৎ আত্মহত্যা বাহিনী আছে, এটিও সেইরূপ। এতে বেশ সুস্থ সবল ও উৎসাহী কয়েকটি যুবক তাদের শরীরের রক্ত দিয়ে প্রতিজ্ঞা-পত্র স্বাক্ষর করে। যদিও জাতীয় বাহিনীর প্রত্যেকেই প্রাণ দানের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তবুও এই বাহিনীটি বিশেষভাবে গঠিত ও নেতাজীর জন্মোৎসবে রেঙ্গুনের ভারতীয়দের নেতাজীকে উপযুক্ত উপহার দান। নেতাজী নিজে তাঁর জন্মোৎসবের পক্ষপাতী ছিলেন না। যখন এখানে সব কিছু ঠিক হয়, তখন তিনি বিশেষ কাজে জাপানে ছিলেন। ফিরে এসে দেখেন সব কিছু বন্দোবস্ত হয়ে গেছে—কাজেই দেশবাসীকে নিরুৎসাহ

করে তিনি তাদের দুঃখিত করতে চাননি।

নেতাজীকে আমাদের দেশবাসী যে কতখানি শ্রদ্ধাভক্তি করে এ তারই একটি নিদর্শন। তখন টাকাকড়ি ও কাপড়ের বিশেষ দরকার। কাজেই প্রত্যেক ভারতীয় তাদের সর্বস্ব নেতাজীকে দান করেছেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য। হবিব, করিম, গণি, আদমজী প্রভৃতি রেংগুনের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা তাঁদের কোটি কোটি টাকার ব্যবসা ও সম্পত্তি সবই দান করে ফকির হয়েছেন।

নেতাজী রেঙ্গুনে যখন ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের কবরে তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেন, তখন তিনি হৃদয়াবেগ রুদ্ধ রাখতে পারেননি। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেন, "হে ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাট, আমি আজ দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি, আপনার এই দেহাবশেষ আমরা ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। তারপর যেখানে সমস্ত সম্রাটের দেহ সমাধিস্থ রয়েছে, সেইখানে আমরা আপনার এই দেহাবশেষও সমাধিস্থ করবো।" ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাটের প্রতি স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্টের তরফ থেকে আমাদের নেতাজীর এই শ্রদ্ধাঞ্জলি তাঁর মহান্ হৃদয় ও দেশপ্রেমের প্রকৃত পরিচয়।

ক্যাপ্টেন মল্লিকের মুখেই শুনলাম রেঙ্গুনে আমাদের হাসপাতালের উপর নিদারুণ ও হৃদয়হীন বিমানাক্রমণের প্রকৃত খবর। ফেব্রুয়ারী মাসের এগার তারিখে বৃটিশের বহু বিমান, সংখ্যায় প্রায় ষাটখানা, ভীষণভাবে এই হাসপাতালটির উপর আক্রমণ চালায়। মিয়াং নামে জায়গাটি একেবারে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় সেদিনের আক্রমণে। এখানকার হাসপাতালটি বহুদিনের—এখানে আমাদের বহু রুগী থাকতো। একদিন হঠাৎ বিমান-গুলি এসে আক্রমণ শুরু করে। প্রথমে কয়েকটি বোমা পড়ার পর ধূলি ও ধোঁয়াতে একেবারে সব জায়গা অন্ধকার হয়ে যায়। পাঁচ হাত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় না। রুগী ও ডাক্তাররা প্রত্যেকেই অসহায়ভাবে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটাছুটি করে। অনেকে ট্রেঞ্চে আশ্রয় নেয়। প্রথম বোমা বর্ষণের পর শুরু হয় পেট্রল ও আগুনে বোমা। হাসপাতালের পাশে একটি পুকুর ছিল। আগুন দেখে অনেকেই জলের মধ্যে আশ্রয় নেয়। তারপর শুধু পেট্রল ও আগুন। সারা পুকুরে পেট্রল ছড়িয়ে পড়ে ও আগুন লাগে। আহতদের ভীষণ আর্তনাদ। ধূলি ধোঁয়া ও মানুষ পুড়ে যাওয়ার ভীষণ দুর্গন্ধে স্থানটি একেবারে শ্মশানে পরিণত হয়। কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী এই ভীষণ 'কারপেট বোম্বিং' চলে। চার-পাঁচ মাইল এলাকা জুড়ে শুধু ধ্বংসস্তূপ।

এই বিমানাক্রমণের খবরে নেতাজী বিশেষভাবে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি তৎক্ষণাৎ হাতপাতালে জন্য প্রস্তুত হন কিন্তু আক্রমণ এত ভীষণ ছিল যে, তখন পথে বার হওয়া অসম্ভব ছিল। আক্রমণ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'মিয়াং'-এ এসে উপস্থিত হন। আহতদের বর্মা স্টেট হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনি নিজে সেখানে দাঁড়িয়ে সব কিছু বন্দোবস্ত করেন। সেখানে তখন তাঁর উপস্থিতি যেন দেবতাদর্শনের মতো প্রত্যেকের প্রাণে সজীবতা এনে দিল। প্রায় দেড় শো থেকে দু'শো রুগী মারা যায় এই বিমান-আক্রমণে। হাসপাতালের উপর এই নৃশংস আক্রমণে রেঙ্গুনের প্রত্যেক ভারতীয় ও বর্মী বৃটিশের প্রতি বিশেষভাবে বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। পরে ভারতীয়দের এক সভাতে আবার দুই কোটি টাকা তুলে নূতন হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই আক্রমণের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসী পুনরায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

আহতরা বর্মা স্টেট হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর বর্মা গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রীরা হাসপাতাল পরিদর্শন করে রুগীদের সব রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেন। নেতাজী প্রতিদিন দু'বেলা হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে প্রত্যেক রুগীকে নিজে দেখতেন। তাদের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা হয়। এই দুর্দশা দেখে তিনি খুবই দুঃখিত হন। তিনি নিজে কোনও দিন কিছুমাত্র ভীত হননি। বিমান আক্রমণের সময় তিনি কদাচিৎ ট্রেঞ্চে যেতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমি যে মহৎ কাজে জীবন উৎসর্গ করছি, তার জন্য ভগবান আমার সহায়, কাজেই বৃটিশের এমন কোনও গোলাগুলী তৈরী হয়নি, যার দ্বারা আমার মৃত্যু

ঘটাতে পারে। আমাকে হত্যা করার জন্য বৃটিশ এখানে পর্যন্ত গুপ্তঘাতক পাঠিয়েছে—তারা কয়েকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।' কি অসীম দেশভক্তি ছিল তাঁর। হৃদয়ে কি অসীম বিশ্বাস তিনি পোষণ করতেন। তাঁর মতো মহান্ ব্যক্তিকে নেতারূপে পেয়ে ভারত-বাসী ধন্য হয়েছে। তাঁর নিজের অসীম বিশ্বাস তিনি অপরের হৃদয়েও আরোপ করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর হৃদয়ে এত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি প্রায়ই বলতেন—

'The power which could not prevent me to come out of India, cannot prevent me to go back to India'.

অর্থাৎ "যে শক্তি ভারত থেকে আসার পথে আমাকে বাধা দিতে পারেনি, সেই শক্তি আমাকে ভারতে ফিরে যাওয়ার পথেও বাধা দিতে পারে না।" তাঁর এই বাণী আমাদের সৈন্যদের কাছে দৈববাণীর মতোই ছিল। তাইতো প্রত্যেকের প্রাণে যে দেশপ্রেমের সঞ্চার হয়েছে, যে অসীম বিশ্বাস তাদের হৃদয়ে এসেছে, তা নষ্ট হতে পারে না। নেতাজীর বাণী—এ যে দৈববাণী, নেতাজীর আদেশ—এ যে দেবতার আদেশ।

আমরা ফ্রন্টে ছিলাম; কাজেই খবরের কাগজে সব খবর পেলেও আজ প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে সব খবর শুনে বুঝতে পারলাম, প্রকৃত ব্যাপারটা কত ভয়ঙ্কর। এই সমস্ত ঘটনার সময়ে ও পরে আমাদের ঝাঁসি রাণী রেজিমেন্টের নার্সিং মেয়েরা যে বীরত্ব ও যোগ্যতা দেখিয়েছেন, তা প্রকৃতই প্রশংসার্হ। তাঁদের আপ্রাণ সেবাই আমাদের বহু রুগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধে এই দান চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে।

জিয়াওয়াদীতে বস্তির পাশে অনেকগুলি আমবাগান ছিল। আমরা তার মধ্যেই কুটীর বেঁধে বাস করতাম। প্রায় প্রত্যেক বস্তিতেই আমাদের পঞ্চাশ-ষাট জন করে লোক থাকতো। তারপর বাগানে থাকাতে বিমান থেকে আমাদের কেউ দেখতে পেতো না। আমরা দিনের বেলা পথে বিশেষ চলাচল করতাম না। বেশীর ভাগ বাইরের কাজই রাতে চলতো। গাদুগড় হাসপাতালে আমার পুরাতন বন্ধু লেঃ অর্ধেন্দু মজুমদারও কাজ করতো। এখানকার 'এরিয়া কম্যান্ডার' কর্নেল পি. এন. দত্ত। দু'নম্বর হাসপাতাল, যেটি মনেয়াতে কাজ করতো, তার কাজ এখন বন্ধ। এখানে আজাদ হিন্দ দলের বহু লোক ছিল। তাদের কাজ ছিল—গ্রামে গ্রামে ঘুরে টাটকা শাক-সবজি, ডিম ও দুধের ব্যবস্থা করা। এখানেই প্রত্যেক গ্রামেই অনেক গরু ও মহিষ ছিল। রুগীদের জন্য প্রত্যহ অনেক দুধ কেনা হতো।

নদীর তীরে নাসিলং নামে একটি গ্রাম ছিল। সেখানকার 'তাজি' অর্থাৎ সর্দারের সঙ্গে আমাদের বেশ জানাশোনা ছিল। আমাদের সেখানে যাওয়ার জন্য সে আমাদের প্রায়ই নিমন্ত্রণ করতো। একদিন সন্ধ্যার পর আমরা প্রায় দশজন ডাক্তার সেখানে বনভোজনের জন্য যাত্রা করি। জ্যোৎস্নারাত্রিতে গরুর গাড়িতে করে গ্রামে পেঁছিলাম। সর্দার আমাদের জন্য সবকিছু বন্দোবস্ত করেছিল। আমরা রাতে সেখানে ঘুমালাম। সকালে নদীতে-ধরা টাটকা মাছ যথেষ্ট পাওয়া গেল। দলে আমরা প্রায় বেশীর ভাগই ছিলাম বাঙালী। কাজেই টাটকা মাছ আমাদের কাছে পরম লোভনীয়। মাংস রাঁধলেন আমাদের কর্নেল গোস্বামী। সকলে মিলেমিশে আর সব রান্না করা হলো। খোলা পল্লীতে আমরা একসঙ্গে বহুদিন পরে আবার একটি পিকনিক বিশেষভাবেই উপভোগ করলাম। ফিরে এলাম সন্ধ্যার একটু আগে। অবশ্য আসবার সময় কিছু মাছ আমরাও সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম। রাতে তিওয়ারী চকে মেজর চক্রবর্তীর কাছে খাওয়ার পর্বটা শেষ করে যে যার নিজ নিজ ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

এমনিভাবেই আমাদের এখানে দিন কাটছিল। কয়েক ঘর বাঙালীও এখানে সপরিবারে বাস করতেন। এ'রা সকলেই আগে চিনির কলে কাজ করতেন। আমি যে গ্রামে থাকতাম তার কাছেই ছোট একটি নদী। নদীর ওপারে 'ফিউ' নামে একটি গ্রাম। এই গ্রামটিতে জাপানীদের অনেক রেশন ছিল। বৃটিশ এ খবর জানতে পারে। কাজেই রোজ তিন-চারবার করে এখানে বিমান আক্রমণ হতো। এই বিমান আক্রমণ এমন ধারাবাহিক কাজে পরিণত হয়েছিল যে, এদিকে বিমান দেখলেই আমরা জানতাম তারা 'ফিউ'-এর উপর আক্রমণ চালাবে।

তখন আমাদের দু'নম্বর ডিভিসন পোকোকুর ওদিকে যুদ্ধ করছে। এদিকে আমাদের সৈন্যরা যেভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে জগতের ইতিহাসে তা' চিরদিন অক্ষয় হয়ে থাকবে। মেজর ধীলনের নেতৃত্বে নেহরু রেজিমেণ্টের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ বৃটিশ পক্ষে এতটা ভীতির সঞ্চার করে যে, তারা আমাদের সৈন্যদের দেখলেই 'চলো, দিল্লীওয়ালা আ গিয়া' বলে পালিয়ে যেতো! তারা বার বার নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে—কিন্তু প্রতিবারেই আমাদের প্রচণ্ড আক্রমণে ব্যর্থ হয়।

সুন্দরম্ নামে একটি মাদ্রাজী ছেলে—কয়েকটি ভাষা বেশ সুন্দরভাবে বলতে পারতো। সে মাঝে মাঝে শত্রুদের শিবিরে গিয়ে গোপনে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করতো। একবার একটি গুর্খাবাহিনী তাকে ধরে ফেলে আর বলে, 'তুমি আমাদের পক্ষে যোগদান করে অপরপক্ষের সব খবর আমাদের জানাও!' সে অস্বীকার করলে তাকে হত্যা করার ভয় দেখানো হয়। সে বলে, 'আমি মুক্তি ফৌজের সেনা, মৃত্যুকে আমি মোটেই ভয় করি না।' তখন একজন গুর্খা তার হাতের একটি আঙুল কেটে তাকে ছেড়ে দেয়। সে আবার ফিরে আসে।

দু' নম্বর ডিভিসনের আরও একটি মাদ্রাজীর বীরত্বপূর্ণ কাহিনী আমরা শুনেছি। এই ছেলেটি যখন রণক্ষেত্রে এগিয়ে যায় তখন তার কাছে পায়ের বুট ছিল না। রণক্ষেত্রে পেঁৗছানোর কিছু পর বুট, জামা-প্যাণ্ট সে পায়। এগুলি পাওয়ার পর সে খুব আনন্দিত হয় আর ভাবে যে, তার জন্যই বিশেষ করে নেতাজী এগুলি পাঠিয়েছেন। সে নূতন বুট ও জামা-প্যাণ্ট পরে একেবারে তাদের কম্যাণ্ডারের সামনে উপস্থিত হয় আর অনুরোধ করে যে, কাল যে দল আক্রমণের জন্য যাবে, তাকেও যেন সেই দলে পাঠানো হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলে যে, নেতাজী তাকে নূতন বুট পাঠিয়েছেন, কাজেই সেও নেতাজীকে যোগ্য সম্মান দেখাতে চায় তার নিজের কর্তব্য পূর্ণ করে। তাকে পরদিনের আক্রমণে পাঠানো হয় কিন্তু ফিরে আর সে আসেনি! এই ঘটনা থেকেই বুঝতে পারা যায় সিপাহীরা নেতাজীকে কতটা সম্মান করতো; তাঁর নাম নিয়ে কিভাবে হাসতে হাসতে মৃত্যুবরণ করতো! আমি বিশেষ দুঃখিত যে, এই বীরের নাম আমার স্মরণ নেই।

কর্নেল শাহ নওয়াজের নেতৃত্বে দু'নম্বর ডিভিসন বিশেষ বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করলেও রিয়াজমদন, এম. এন. দে ও অন্য একজন অফিসার ভারতীয় বাহিনীর কলঙ্কস্বরূপ বৃটিশপক্ষে যোগদান করে। নিতান্ত আশ্চর্য ও দুঃখের বিষয় যে, আজও ভারতবর্ষে মীরজাফর বা উমিচাঁদের অভাব হয় না! এদের পলায়নের সংবাদে নেতাজী বিশেষ দুঃখিত হন। এর কিছুদিন পরেই নেতাজীর একটি আদেশপত্র আসে। তাতে লেখা ছিল, "আমাদের কয়েকজন অফিসার বৃটিশ পক্ষে যোগ দিয়েছে। আমার সৈন্যদের কাছ থেকে আমি এইরূপ কাজ মোটেই প্রত্যাশা করিনি। আমি প্রথমে বিশেষ কঠোরতা অবলম্বন করিনি। জীবনে আমার অধিকাংশ সময়ই কারান্তরালে কেটেছে। সে জীবন যে কতটা দুঃসহ তা আমি নিজে উপভোগ করেছি। সুতরাং আমার কোনও অফিসার বা সৈন্যকে আমি সেই দুঃসহ কষ্ট দিতে ইচ্ছুক ছিলাম না। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার যেরূপ পরিবর্তন হচ্ছে তাতে বিশেষ দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বিশেষভাবে কঠোরতা অবলম্বন করার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। আমার বাহিনীতে আমি এমন কোন লোক চাই না, যারা সুযোগ পেলে অপর পক্ষে যোগদান করতে পারে। সুতরাং আমি জানাচ্ছি যে, ভবিষ্যতে যাতে এরূপ ঘটনার পুনরাভিনয় না হতে পারে, তার জন্য সর্বপ্রকার কঠোরতা অবলম্বন করা হবে। আমার প্রকৃত দেশভক্ত সৈনিক ও অফিসারদের জানাচ্ছি, তাঁরা যদি এমন কোনও সন্দেহভাজন লোককে দেখেন যে, অপরপক্ষে যোগদান করতে পারে, তাহলে, জানবেন তার ব্যবস্থা হবে চরম শাস্তি—মৃত্যু। এই মৃত্যুদণ্ডের জন্য কোনও আদালতের দরকার হবে না, যে-কোনও দেশভক্ত ঐরূপ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে মারতে পারে। এই আদেশ প্রত্যেককে প্রত্যহ শুনানো হবে। তারপর দিন স্থির করে, যারা পালিয়েছে সেই সমস্ত লোকদের প্রকাশ্য সভায় নানাভাবে অপদস্ত করা হবে।—তাদের প্রতিমূর্তি তৈরী করে তাতে আগুন দেওয়া প্রভৃতি নানাপ্রকার আয়োজন হবে।"

নেতাজীর আদেশ মতো নানাস্থানে পলাতক অফিসারদের খড়ের প্রতিমূর্তি তৈরী করে তাতে আগুন দেওয়া হয়। প্রত্যেককে বিশেষভাবে প্রতিদিন 'রোল' করে শুনানো হয় নেতাজীর এই আদেশ।

॥ ১০ ॥

এইভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। যুদ্ধের অবস্থা তত সুবিধের নয়, বৃটিশ সবেগে এগিয়ে আসছে। আমাদের রেজিমেণ্ট পরাজিত হয়েছে। বৃটিশ শুনছি প্রায় টাঙ্গুর কাছাকাছি এসে পড়েছে। তখন কথা উঠলো আমাদের এখানকার লোকেরা যুদ্ধ করবে কিনা। এখানে আমরা সবসুদ্ধ প্রায় তিন হাজার ছিলাম। তার মধ্যে হাজারখানেক রুগী, প্রায় পাঁচশো হাসপাতালের লোক ও প্রায় পাঁচশো আজাদ হিন্দ দলের লোক। পরে শুনলাম, নেতাজীর আদেশ—এখানে যুদ্ধ হবে না, আত্মসমর্পণ করতে হবে। কারণ আমরা বাধা দিয়ে কিছু করতে পারবো না, অনর্থক লোকক্ষয় হবে। এপ্রিলের মাঝামাঝি এইরূপ অবস্থা। এপ্রিলের আঠার তারিখে দুপুরের দিকে প্রায় বাইশখানা 'ডবল বডি' বিমান দেখা গেল। প্রথমে ভাবলাম, তারা 'ফিউ' যাবে কিন্তু দেখা গেল তারা চিনির কলের কাছাকাছি হঠাৎ নীচে নেমে বোমা ফেলতে শুরু করলো। স্টেশনের কাছাকাছি কয়েকটি বড় বড় ধানের গুদামে আগুন লাগলো। অল্প কিছুক্ষণ মেসিনগান চালানোর পর বিমান-গুলি চলে গেল। অনেকেই ছুটে গিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তা সম্ভবপর হলো না। গুদামের ধান সব পুড়ে গিয়েছে। সেই বিমান আক্রমণের সময় দু'নম্বর হাসপাতালের কম্যাণ্ডার মেজর রঙ্গচারী চিনির কলের কাছাকাছি একটা বাড়িতে ছিলেন। আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে নিকটবর্তী ট্রেঞ্চে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তৎক্ষণাৎ বোমার একটি বিরাট টুকরো তাঁর দেহকে একেবারে দু'টুকরো করে প্রায় একশো গজ দূরে ছুড়ে ফেলে। কাছাকাছি একটি ট্রেঞ্চে চাপা পড়ে একটি বাঙালী ভদ্রলোকও সেদিন মারা যান। তাছাড়া কয়েকজন সিভিলিয়ন আহত হয়। মেজর রঙ্গচারী মারা যাওয়াতে আমরা সকলেই শোকাভিভূত হয়ে পড়ি, কারণ তিনি সকলেরই খুব প্রিয় ছিলেন। যে বাঙালী ভদ্রলোকটি মারা যান, তিনি এখানকার চিনির কলে কাজ করতেন। তিনি মারা যাওয়াতে তাঁর স্ত্রী পাঁচটি শিশু সন্তানসহ একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন। মিলের ম্যানেজারের সাহায্যে তাঁদের কিছু বন্দোবস্ত হয়।

এই ঘটনার পরই একদিন রাতে একটি বিশেষ চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। নদীর প্রায় তীরের কাছ দিয়ে আমাদের রক্ষীরা পাহারা দিচ্ছিল। তারা চারটি গরুর গাড়ি ও কয়েকজন বর্মীকে রাইফেল হাতে যেতে দেখে। তখন বর্মী সৈন্যরা এমনিধারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতো কতকটা ছত্রভঙ্গ অবস্থায়। তবুও রক্ষী প্রথম বর্মীকে আটকায়। তাকে প্রশ্ন করায় সে জানায়, বর্মীবাহিনীর সে একজন সৈন্য। তখন আমাদের রক্ষী তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের সঙ্গে কোনও অফিসার আছে কিনা। যদি থাকে তাকে ডেকে দাও এবং আমাদের রক্ষীদলের কম্যাণ্ডার অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে বলো।' তখন বর্মীটি তাদের অফিসারকে ডেকে আনে। তাকে দেখতে ঠিক গোরার মতো, কাজেই আমাদের রক্ষীর সন্দেহ হয়। বর্মী ও অফিসারটি আমাদের অফিসারের কাছে আসে। অফিসারটি বলে, সে বৃটিশ অফিসার। তখন আমাদের অফিসারটি তাদের দু'জনকেই ধরে বেঁধে ফেলতে বলে। বাইরে আর যে বর্মীরা ছিল তারা ব্যাপারটা সন্দেহজনক বুঝতে পেরে মেসিনগানের গুলি চালাতে শুরু করে। আমাদের পক্ষ থেকেও গুলি ছোঁড়া হয়। বর্মীরা গরুর গাড়ি ও মেসিনগান ফেলে পালিয়ে যায়। আমাদের পক্ষে তিনজন মারা যায় ও পাঁচ-সাতজন গুরুতররূপে আহত হয়। সেই বৃটিশ অফিসার ও বর্মীটিকে ধরে এরিয়া কম্যাণ্ডারের নিকট নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি তাদের জাপানীদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য স্থানীয় পুলিশের হাতে দেন। পরে শুনলাম তারা পালিয়ে গিয়ে আবার বৃটিশের

সংগে মিলিত হয়। এই বৃটিশ অফিসারটি কাছাকাছি পাহাড়ে রেডিও নিয়ে 'গেরিলা'র মতো গুপ্তচরের কাজ করতো। এখানকার বর্মীদের বহু টাকা পয়সা দিয়ে তাদের হস্তগত করে। 'ফিউ'য়ে যে বিমান আক্রমণ হয়, শোনা যায়, এটা তারই নির্দেশে। মাঝে মাঝে একটি বিমান সন্ধ্যার একটু আগে খুব আস্তে আস্তে আকাশে ঘোরাঘুরি করতো। আমরা ভাবতাম, হয়তো 'রেকি প্লেন', কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, নীচের থেকে খবর ধরবার জন্য এটা ঘোরাফেরা করতো। পালাবার সময় বর্মীরা যে গরুর গাড়িগুলি ফেলে পালায় তাতে মেসিনগান, রেডিও সেট, বিস্কুট প্রভৃতি ছিল।

বৃটিশ ট্যাংগু পেঁছে গেছে। দূরত্ব এখান থেকে মাত্র ত্রিশ মাইল। আমাদের এখানে পেঁছতে খুব বেশী দেরী হবে না। আমরা আত্মসমর্পণ করলে আমাদের সংগে কিরূপ ব্যবহার করা হবে তাই নিয়ে আমরা জল্পনা-কল্পনা শুরু করলাম। অবশ্য আমরা ভালো কোনও ব্যবহার প্রত্যাশা করিনি। আমাদের মধ্যে কয়েকজন আত্মসমর্পণের একেবারে বিরুদ্ধে। তারা বলে, যখন একবার অস্ত্র গ্রহণ করেছি তখন তা ছাড়বো না। হোক নেতাজীর আদেশ। অনেকে আবার অনেক রকম বুঝতে লাগলো। কিছু লোক আত্মসমর্পণ করার চাইতে মৃত্যু শ্রেয় ভেবে আত্মহত্যার চেষ্টা করতে লাগলো। আবার কেউ কেউ খুব ভীত হয়ে পড়েছে এই ভেবে যে, ওদের হাতে ধরা পড়লে যা ব্যবহার করবে তা হবে অসহনীয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেকেই এক অনাগত অবস্থার জন্য বিশেষভাবে বিচলিত। অনিশ্চিত আশঙ্কায় প্রত্যেকেই অপেক্ষা করতে লাগলো বৃটিশের আগমন।

চব্বিশে এপ্রিল ১৯৪৪ঃ—বৃটিশ এগিয়ে আসছে। কাল শুনেছি এখান থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে আছে। কাজেই, আজ যে এখানে এসে পেঁছবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হাসপাতালের কাজ যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগলো। গ্রামবাসীরা বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। আমাদের সকলেই বিষাদমগ্ন। জীবনে এমন দিন যে আসবে তা কেউ কল্পনা করেনি। ভেবেছিলাম আমাদেরও হবে "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।" কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, তাই এই দুটির একটিও আমাদের দ্বারা সম্ভবপর হলো না। ধন্য তারা—যারা দিল্লীর পথে মৃত্যু বরণ করেছে। অন্তত আজকের এই গ্লানি, এই অবমাননা তাদের সহ্য করতে হলো না।

সকাল থেকেই কয়েকখানা প্লেন সারিবন্ধ হয়ে রাস্তার উপর পাহারা দিতে লাগলো। তখনই বুঝতে পারলাম বৃটিশের অগ্রগতি শুরু হয়েছে। আমরা আমাদের কম্যান্ডার সাহেবের আদেশ মতো ইউনিফরম পরে যার যার জায়গায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বেলা প্রায় একটার সময় কয়েকটি ট্যাংক সোজা রাস্তা ধরে 'ফিউ'-এর দিকে এগিয়ে গেল। মাঝে মাঝে কয়েকটি মেসিনগানের গুলীর আওয়াজ শুনলাম। 'ফিউ'-এ কিছু অসুস্থ জাপানী ছিল, নদীর এপারে কোনও জাপানী ছিল না। নদীর পুল ভাংগা, কাজেই সন্ধ্যার আগে বৃটিশ পুল তৈরীর কাজে লেগে গেল। বেলা প্রায় পাঁচটার সময় অনেকগুলি ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ি গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়লো। এরা সকলেই বৃটিশ ভারতীয় সেনাদল। আমাদের কাছে এসে বিশেষ কৌতূহলের সংগে দু'চারটি প্রশ্ন করে তারা চলে গেল। সন্ধ্যায় শুনলাম বৃটিশের ডিভিসন হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের এখানকার উচ্চপদস্থ অফিসারকে ডেকে পাঠিয়েছে। এখানে বেশীর ভাগই রুগী, আর আমাদের হাসপাতাল কাজ করছে বলেই হাসপাতালের তরফ থেকে মেজর খান ও মেজর পুরী অন্য দু'জন অফিসারের সংগে ডিভিসন হেডকোয়ার্টারে গেলেন। আমরা স্বস্থানেই রইলাম আদেশের অপেক্ষায়।

মন কারও ভালো ছিল না। কাজেই রান্না হয়নি। আমরা আমাদের এই দুঃখের দিনে চোখের জল রাখতে পারলাম না। বিরাট আশা, হৃদয়ের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, সবই আজ অনায়াসে মাটিতে মিলিয়ে গেল।

রাতে শত চেষ্টাতেও কিছুতেই চোখে ঘুম এল না—ভবিষ্যতে কি পরিণতি হবে সেই চিন্তাতেই। মৃত্যুর জন্য ও নানা রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম, তার জন্যে মোটেই ভয় পাইনি, কিন্তু আজ এই অবস্থা পরিবর্তনে ভীত না হলেও মনের মধ্যে নানারূপ চিন্তা এসে চোখের ঘুম কেড়ে নিলো। সকালে হাতে কোন কাজ ছিল না,

কাজেই ঘটনা কতদূর কি গড়িয়েছে, আর প্রকৃত খবর কি, জানবার জন্য গাদ্‌গড় হাসপাতালে এসে হাজির হলাম। কাল রাতে যে অফিসাররা দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ফিরে এসেছেন। ডিভিসন হেড-কোয়ার্টারে শুনলাম তাঁদের সঙ্গে কোনরূপ খারাপ ব্যবহার করা হয়নি। অন্য আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের কাজ যেমন চলছে তেমনি চলবে। সকালে কয়েকজন বৃটিশ অফিসার 'জিপ' গাড়ি নিয়ে হাসপাতালে এসে হাজির হয়েছে আমাদের কয়েকজন অফিসারকে হেড-কোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মল্লিকদা কয়েকটা হাঁস পুষেছিল; এবার সেগুলি শেষ করতে হবে। কাজেই আমিও দুপুরে সেখানে রয়ে গেলাম খাওয়ার জন্য। সারা দুপুর আমরা নানারকম ভবিষ্যৎ চিন্তা করলাম। শুনলাম বর্তমানে বৃটিশ আমাদের সঙ্গে 'যুদ্ধবন্দী' হিসাবেই ব্যবহার করবে।

সন্ধ্যার আগেই আমাদের গ্রামে ফিরে এলাম। প্রথমে যতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম এখন সেভাব কতকটা কাটিয়ে উঠলাম। পরদিন দুপুরে হুকুম হলো সন্ধ্যার সময় আমাদের মালপত্র নিয়ে আমরা যেন চিনির কলের কাছে হাজির হই। নিজে যে জিনিস বয়ে নিতে যেতে পারা যায় শুধু তাই থাকবে। তার বেশী কিছু নয়। কাজেই ঔষধের সব বাক্স গ্রামের সর্দারের জিম্মায় রেখে 'পিঠু' পিঠে নিয়ে সন্ধ্যার পর চিনির কলের কাছে উপস্থিত হলাম। সেখানে শুনলাম, রাতে আমাদের এখানেই থাকবে হবে। কলের কাছাকাছি, ছোট ছোট অনেক বাংলোয়, একটি রাজবাটীতে ও পাশের খালি গ্রামে আমাদের থাকার জায়গা দেওয়া হলো। রাজবাড়িটি বেশ বড়। সেখানে আমাদের হাসপাতালের রুগীদের রাখার ব্যবস্থা হলো। রাতে একটি কুটিরে শুয়ে আরামে ঘুম দিলাম। এখন নূতন অবস্থার জন্য আমরা তৈরী হয়েছি—কাজেই মনের কোণে আর কোন চিন্তাকে স্থান দিলাম না। একবার মালয়ে জাপানীদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম। অবস্থা বিপর্যয়ে আজ আবার বন্দী হলাম—বৃটিশের হাতে।

প্রথমে এখানে একজন বৃটিশ মেজর আমাদের সবকিছু বন্দোবস্ত করছিলেন। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রাদি এখনও আমাদের কাছেই ছিল। তৃতীয় দিনে সেগুলি সব জমা হলেও কিছু সৈন্যের হাতে রাইফেল দিয়ে আমাদের ছোট একটি গার্ড পার্টি রইলো।

গ্রাম থেকে হাসপাতাল তুলে নিয়ে এসে রাজবাটীতে আমাদের হাসপাতাল খোলা হলো। হাসপাতালের কাজ আগের মতোই চলতে লাগলো। বাইরে আমাদের সমস্ত অফিসার ও সৈন্যদের তালিকা তৈরী হলো। আমাদের পুরাতন পদবী, পুরাতন ইউনিট, নূতন ইউনিট, নূতন পদবী প্রভৃতি। সিভিলিয়ানদের আলাদা করে তাদের তালিকা দেওয়া হলো। অন্যান্য সৈন্যদের থেকে হাসপাতালের ডাক্তার ও সিপাহীদের আলাদা করা হলো। আমরা সকলেই হাসপাতালের কাজ করতে লাগলাম। শুনলাম, আমাদের এখানে আরও কিছুদিন থাকতে হবে, তারপর আস্তে আস্তে আমাদের এখান থেকে সরানো হবে। প্রথমে যাবে অন্যান্য ইউনিট, সকলের শেষে যাবে রুগীরা ও হাসপাতাল।

এখানে আমাদের আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের অনেক জিনিসপত্র ছিল, এমনকি নিজেদের প্রেস পর্যন্ত। অনেক জিনিসপত্র, কাগজ, বোর্ড প্রভৃতি জমা ছিল। বৃটিশের কয়েকজন অফিসার আমাদের জিনিসের তালিকা তৈরী করতে এসে কতকগুলি বাক্সের উপর H. E. Col. Chatterjee দেখে জিজ্ঞাসা করেন H.E. কথাটার অর্থ কি? আমরা বুঝিয়ে দিলাম, H.E. মানে হচ্ছে His Excellency. শুনে প্রথমে একটু আশ্চর্য হন, পরে সব পরিচয় দেওয়াতে বুঝতে পারলেন, ইনি হচ্ছেন আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রী। এদের কথাবার্তায় বেশ মনে হলো, এরা আমাদের গভর্ণমেণ্টের বিষয় সবকিছু জানে। এরা বেশ মনোযোগ দিয়ে আমাদের দেওয়ালে টাঙ্গানো আজাদ হিন্দ ফৌজের ছবি দেখতে লাগল।

বৃটিশের কোয়ার্টার মাস্টার একবার জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের এখানে কতজন হিন্দু ও কতজন মুসলমান আছে?' সেই হিসাবে তারা আমাদের 'ঝটকা' ও 'হলাল' মাংস দেবে। আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার জানায়, 'তোমরা যা দেবে আমরা তাই খাবো। হিন্দু বা মুসলমানদের জন্য আলাদা কিছু বন্দোবস্ত করতে হবে না।'

এখানে বৃটিশ আসার পরই আমাদের কয়েকজন অফিসারকে বিমানে করে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়। কর্নেল আজিজ, কর্নেল দত্ত, কর্নেল জাহাঙ্গীর, মেজর ঘোষ, মেজর খান ও মেজর পুরী এই প্রথম দলে ছিলেন। হাসপাতালের কর্নেল গোস্বামী আমাদের সঙ্গেই রয়ে গেলেন। এখানে প্রথমে একজন বৃটিশ মেজর আমাদের দেখাশোনা করতেন। পরে তিনি বদলি হয়ে যাওয়াতে পাইওনিয়ার কোরের একজন লেঃ কর্নেল আমাদের ভার গ্রহণ করেন। আমরা ধরা পড়ার পর আমাদের সঙ্গে কেউ কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। আমাদের বাইরে যাতায়াত বন্ধ ছিল, অবশ্য তার জন্য বৃটিশ পক্ষ থেকে কোনরূপ রক্ষীর বন্দোবস্ত ছিল না। আমাদের সৈন্যরাই রক্ষীর কাজ করতো। রেশনও আমাদের ভালোই দেওয়া হতো। বৃটিশ পক্ষের ভারতীয় সৈন্যরা যে পরিমাণ রেশন পেতো আমরাও তাই পেতাম। তাছাড়া রুগীদের জন্য বাইরে থেকে ডিম ও দুধ কেনবার কোন বাধা ছিল না। বৃটিশ এখানে আসার পরই সকলকে শুনিয়ে দেয়—জাপানীদের নোটের কোন মূল্য নেই। জাপানী নোটের পরিবর্তে বৃটিশ কোন মূল্য দিতেও প্রস্তুত নয়। কাজেই জাপানী নোট বাজে কাগজের মতো।

মাঝে মাঝে এখানে বৃটিশ পক্ষ থেকে অনেক অফিসার আমাদের হাসপাতাল পরিদর্শন করতে আসতেন। তাঁরা আমাদের বিরাট হাসপাতাল দেখে আশ্চর্য হতেন। কেউ কেউ বলতেন, 'শুনেছিলাম ভারতীয়রা জাপানীদের সঙ্গে মিশে যুদ্ধ করছে, তাদের নিজেদের কিছুই নেই, কিন্তু এই হাসপাতাল দেখে সত্যই আশ্চর্য হচ্ছি।' অনেকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'শুনেছি আপনাদের মোটর প্রভৃতি কিছুই ছিল না। পায়ে হেঁটে ফ্রণ্টে গিয়েছিলেন, তা কি সম্ভবপর?' আমরা জানাতাম, অবস্থা প্রায় তাই ছিল। আমরা অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করেছিলাম। একদিন বৃটিশ পক্ষের একজন ভারতীয় অফিসার মল্লিকদাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'বাসু এখন কোথায়?' মল্লিকদা ভাবলেন, বোধহয় আমার কথাই জিজ্ঞাসা করছেন। তাই উত্তর দিলেন, 'সে এখানেই আছে। আপনি তাকে চেনেন নাকি?' উত্তরে তিনি বললেন, 'I mean Subhas Basu.' অর্থাৎ 'আমি সুভাষ বসুর কথা বলছি।' মল্লিকদা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'আপনি বোধ হয় জানেন না, তিনি অতি সাধারণ একটি বাসু নন, তিনি আমাদের পূজ্য নেতাজী।'

বৃটিশ পক্ষের বহু ভারতীয় ও বৃটিশ অফিসার এমনি ভাবে প্রায়ই হাসপাতালে আমাদের কাছে আসতেন। এঁদের মধ্যে অনেকে বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে নেতাজীর কথা জিজ্ঞাসা করতেন। অনেকে আবার কতকটা উপহাসের সঙ্গে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করতেন। তবে আমাদের কার্যকলাপ, নানা রকম ছবি—এসব দেখে অনেকেই দুঃখপ্রকাশ করেছেন যে, এতবড় একটি সাধনা বিফল হলো। একজন উচ্চপদস্থ বৃটিশ অফিসার নিজের মুখে বলেছেন, 'যদি আর দুটি দিন আগেও ইম্ফলের উপর আক্রমণ হতো তা হলে আমরা পিছু হটতে বাধ্য হতুম।'

হাসপাতালে দিনগুলি কাটতো বেশ আমাদের। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বর্তমান আঁকড়ে, তাকেই উপভোগ করতাম। শুনলাম, আমাদের সৈন্যদের অল্প অল্প করে পাঠানো হচ্ছে। কিছুদিন পরে আমাদের রুগীদেরও 'এম্বুলেন্স' করে 'টাঙ্গু' হাসপাতালে পাঠানো হতে লাগলো। কতক কঠিন রুগী ছিল। তাদের বিমানে করে ভারতে পাঠানোর বন্দোবস্ত হলো। সেই দলে গেলেন আমাদের কর্নেল গোস্বামী ও ক্যাপ্টেন রায়। আমরা কয়েকজন ডাক্তার ও চারশো নার্সিং সিপাহী একটি দলে ভারতে আসার জন্য তৈরী হলাম। আমাদের লরী করে 'টাঙ্গু' এরোড্রামে নিয়ে এল। কিন্তু শুনলাম বর্তমানে বিমান নেই, কাজেই আমাদের আবার ফিরে আসতে হলো 'জিয়াওয়াদী'। এইভাবে প্রায় দুটি মাস এখানে কাটালাম।

২০শে জুন সকালে আবার তৈরী হওয়ার জন্য আদেশ হলো। সকালে খাওয়া সেরে প্রায় দশটায় তৈরী হলাম। কয়েকখানা লরী করে আমরা প্রায় চারশো জন 'পেগু' এসে পেঁছিলাম। এখানকার জেলখানার লোহার গেট আমাদের জন্য উন্মুক্ত করা হলো। পেগু জেলটি খুবই ছোট, মাত্র ৭০। ৮০ জন কয়েদীর থাকবার মতো জায়গা আছে। কিন্তু তাতেই আমাদের চারশোজনকে ঢুকতে হলো। আমরা ছাড়াও কয়েকজন জাপানী সৈন্য বন্দী হয়ে

এখানে ছিল। গেটের ভিতর প্রবেশ করতেই আমার রেজিমেণ্টের কোয়ার্টার মাস্টার ও তিন-চারজন আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্য 'জয় হিন্দ' রবে আমাদের সংবর্ধনা করলো। ভিতরে চারদিকে সরু বারান্দা ছিল। আমরা বহু কষ্টে তার মধ্যে স্থান করে নিলাম।

এখানে যেমন থাকার অসুবিধা তেমনি অসুবিধা জল ও পায়খানার। তার উপরে মাঝে মাঝে দু'এক পশলা বৃষ্টি যেন আমাদের বিদ্রূপ করেই অসুবিধার মাত্রা আরও বাড়িয়ে তুললো। দ্বিতীয় দিনে হুকুম হলো আমাদের কাছে যা কিছু দ্রব্যসামগ্রী আছে তার তল্লাশী হবে। এখানে এরা আমাদের মূল্যবান সবকিছু জিনিস জমা নেয়। অবশ্য নামে জমা হলেও আমরা কোনও রসিদ পাইনি বা জিনিসও ফেরত পাইনি। ঘড়ি, আংটি, ফাউণ্টেনপেন, সেফটি রেজর ও ছুরি সব কিছুই জমা হয়। এমনকি 'স্টেথস্কোপ' ও 'রেডক্রস' ব্যাজ পর্যন্ত বাদ যায়নি। রেডক্রস ব্যাজ ও স্টেথস্কোপ দিতে যথেষ্ট আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু ফল হয়নি। দু'দিন এখানে ছিলাম। এই দু'দিনেই আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠলো। এখানে ডাঃ ঘোষও বন্দী ছিলেন। তিনি স্থানীয় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সভাপতি ছিলেন। প্রথমে একবার তাঁকে এখানে বন্দী করা হয়, কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি ছাড়া পান। আবার হঠাৎ তাঁকে বন্দী করা হয়।

২৩শে জুন সকালে আমরা তৈরী হলাম রেঙ্গুন যাবার জন্য। এতদিন আমাদের সঙ্গে কোনও রক্ষী ছিল না। কিন্তু এখান থেকে প্রতি লরীতে দু'জন করে বৃটিশ সেনা আমাদের রক্ষী হয়ে লরীতে উঠলো। দুপুর বেলা বেশ জোরেই বৃষ্টি শুরু হলো। সেই বৃষ্টিতে ভিজে আমরা রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেলের সামনে উপস্থিত হলাম। প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর শুনলাম, এখানে স্থানের অভাব, কাজেই আমাদের অন্যত্র যেতে হবে। আবার লরীতে উঠে বসলাম। এবার লরী এসে দাঁড়ালো বর্মার বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত 'ইনসিন' জেলের সামনে।

জেলের প্রবেশপথে এখানেও আমাদের আবার একবার সকলের তালাশী নেওয়া হলো। এখানে রক্ষীদল সকলেই বৃটিশ। গেটের ভিতর দিয়ে একেবারে উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত জেলখানার ভিতরে উপস্থিত হলাম। নেতাজীর "তরুণের স্বপ্নে" এই জেলের নাম শুনেছি। কাজেই দুঃখের মধ্যেও আনন্দ পেলাম যে, যেখানে আমাদের পূজনীয় নেতাজী তাঁর জীবনের কয়েকটি মূল্যবান বৎসর নানা কষ্টে অতিবাহিত করেছেন, অদৃষ্টের পরিহাসে তাঁরই অনুগামী হয়ে আমরাও সেই পবিত্র জেলখানাতে বন্দী হিসাবে প্রবেশ করলাম। দেশকর্মীদের পদধূলিতে বৃটিশের এমনধারা বহু জেলই তো ধন্য হয়েছে—বর্মায়, ভারতবর্ষে ও আন্দামানে।

ইনসিন জেলে

আমাদের আগেই প্রায় তিন হাজার আজাদী সেনা এখানে আশ্রয় পেয়েছে—কাজেই আমরা প্রবেশ মাত্রই 'জয় হিন্দ' ধ্বনি দ্বারা তারা আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। মেজর নেগি তখন এখানকার ক্যাম্পে কম্যান্ডার। তিনি আমাদের থাকবার জায়গার ব্যবস্থা করলেন। আমরা এগার জন ডাক্তার ছিলাম। আমাদের জেল হাসপাতালে থাকার ব্যবস্থা হলো। কয়েকদিন আগেই এখান থেকে একদল ভারতে চলে গিয়েছেন। তাঁদের সংগে কয়েকজন ডাক্তারও গিয়েছেন। বর্তমানে এখানে মাত্র দু'জন ডাক্তার আছেন—ক্যাপ্টেন মকসুদ ও ক্যাপ্টেন নাগরত্নম্। দোতলার একটি ব্যারাকে আমরা সকলে থাকবার জায়গা করলাম। এখানে আসার পর বহু পুরোন বন্ধুবান্ধবের সংগে দেখা হলো এবং খোঁজ-খবরও পাওয়া গেল। এখানকার সতেরো নম্বর 'সেলে' শুনলাম নেতাজী থাকতেন। সেলের দিকটা তালাবন্ধ —সেদিকে যাওয়ার উপায় ছিল না। বড় বড় দোতলা পাঁচটি ব্যারাকে আমাদের লোকেরা থাকতো, আর আমরা সব কয়জন ডাক্তার ও আমাদের রুগীরা থাকতাম হাসপাতাল ব্যারাকে।

এখানকার জেলে বালসেনা দলের প্রায় ত্রিশজন গুর্খা বালক থাকতো। এদের দেশপ্রেম সত্যিই অপূর্ব। এদের বাপ-মা রেঙ্গুনেই থাকেন। তাঁদের কাছে এরা যেতে চায় না। তার চেয়ে জেলখানাতে থাকা এরা গৌরবের বলে মনে করে। এদের দেখে দুঃখ হতো—বয়স সকলেরই প্রায় দশ থেকে বারো। একজন অফিসার এদের দেখাশোনা করতেন। দুপুরে লেখাপড়া শেখাতেন—নানা দেশের ইতিহাস শোনাতেন ও ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস আলোচনা করতেন। এইসব ছেলেদের সাধারণ জ্ঞান সাধারণ বৃটিশ ভারতীয় অফিসারদের চাইতে কোনও অংশে কম তো ছিলই না, বরং ঢের বেশী। আমি একজন বৃটিশ ভারতীয় অফিসারকে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছি—এখান থেকে টোকিও আর কতদূর? কারণ তাকে নাকি বলা হয়েছে, টোকিও জয় করার পর সে বাড়ি যাবার ছুটি পাবে। একজন ঠাট্টা করে উত্তর দেয়, টোকিও এখান থেকে মাত্র দু'শো মাইল দূরে। শুনে অফিসারটি আশ্বস্ত হয়ে বলে—যাক, তাহলে শীগগীরই ছুটি পাওয়া যাবে। অবশ্য সব বিষয়ে ভারতীয় সেনাদের অজ্ঞ রাখাই হচ্ছে বৃটিশের চিরাচরিত নীতি।

এখানে মকসুদ ও নাগরত্নমের নিকট রেঙ্গুনের অনেক খবর শুনলাম, যা আমাদের একেবারেই অজানা ছিল। প্রথমে নেতাজী রেঙ্গুন থেকে পিছু হটতে রাজী হননি। তিনি দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, 'আমার প্রিয় সৈন্যদের এই দুরবস্থায় ফেলে আমি কিছুতেই আত্মগোপন করতে পারি না। তার চেয়ে বরং তাদের সংগে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে নির্ভীক বীরের মতো মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়।' তখন আমাদের উচ্চপদস্থ অফিসাররা বার বার তাঁকে অনুরোধ করে জানান যে, তাঁর জীবন বিশেষ মূল্যবান—এখনও দেশ স্বাধীন হতে পারেনি, এ অবস্থায় তিনি বেঁচে থাকলে পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন, সেখান থেকেই দেশের কাজ করতে পারবেন। কাজেই অবস্থা বিবেচনায় তাঁর পক্ষে আত্মগোপন করা দেশের পক্ষে বিশেষ দরকার। অবশেষে তিনি রাজী হন এবং কয়েকজন অফিসার তাঁকে সংগে করে নিয়ে মৌলমেনে পেঁৗছে দিয়ে আসেন। তিনি চলে যাওয়ার পর মেজর জেনারেল লোগানন্দন রেঙ্গুনের আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়ক হন। অনেকেই বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। তখন তাদের বোঝানো হয় যে, বর্তমানে যুদ্ধ করা মানে অনর্থক মৃত্যুবরণ করা। শুধু সৈন্যদের নয়, রেঙ্গুনের বেসরকারী জনসাধারণেরও ক্ষতি হবে। তার চেয়ে বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে আবার দেশসেবার সুযোগ পাওয়া যাবে। ২৭শে এপ্রিল জাপানীরা রেঙ্গুন ত্যাগ করে। তারা বুঝতে পারছিল, রেঙ্গুনে বৃটিশকে বাধা দেওয়া বৃথা। তার চেয়ে মৌলমেন থেকে যুদ্ধ করা অনেকটা সুবিধার হবে। জাপানীরা

রেঙ্গুন ছেড়ে যাওয়ার পর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সমগ্র রেঙ্গুন শহরের রক্ষার ভার গ্রহণ করে। অরাজকতার সময় খুন, লুঠতরাজ যথেষ্ট হয়ে থাকে, কাজেই তা বন্ধ করার জন্য আমাদের বাহিনী প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক জায়গায় আমাদের রক্ষী রাখা হয় শহরের পথে; সশস্ত্র প্রহরী পুলিশের কাজ করে।

জাপানীরা যে রেঙ্গুন ছেড়ে চলে গেছে বা তারা রেঙ্গুনে যুদ্ধ করবে না এ খবর বৃটিশ পায়নি। কাজেই রেঙ্গুন শহর অধিকার করবার জন্য তারা বিশেষভাবে প্রস্তুত হচ্ছিল। শুধু স্থলসৈন্য দ্বারা রেঙ্গুন জয়ে বিলম্ব হতে পারে ভেবে বৃটিশ নৌসেনা দ্বারা আক্রমণের বন্দোবস্ত করে। তাদের ইচ্ছা ছিল নৌ-বিভাগের বিরাট কামানগুলি ব্যবহার করে রেঙ্গুন শহর প্রথমে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তারপরে তীরে অবতরণ করা হবে। কিন্তু এখানকার লোকেদের সৌভাগ্য বলতে হবে যে, ঘটনা দাঁড়ালো অন্যরকম। মে মাসের প্রথম দিকে বৃটিশের একখানি বিমান রেঙ্গুনের উপর দেখা যায়। জাপানীরা চলে যাওয়ার পর রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেলের ছাদের উপর ওখানকার যুদ্ধবন্দীরা সাদা চুন দিয়ে লিখে রাখে, "এখানে কোনও জাপানী নেই।" বিমানখানা সম্ভবত এই লেখা দেখতে পায়নি। তারপর আমাদের একজন অফিসার বিমানটিকে নীচে নামবার জন্য সংকেত জানান। বিমানটি মিংলাডন এরোড্রোমে নেমে আসে। সেই পাইলটকে সব কিছু জানানো হয়। মোটরে চড়ে সেই পাইলট ও আমাদের অফিসার রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেলের যুদ্ধবন্দীদের সংগে দেখা করেন ও শহর পরিদর্শন করেন। পরে সেই পাইলট 'ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট'এ ফিরে গিয়ে সব কিছু খবর জানানোর পর বৃটিশ বিনাযুদ্ধে চার তারিখে রেঙ্গুন অধিকার করে। প্রথমে বৃটিশ পক্ষের প্রধান অফিসার আমাদের লোকেরা যেভাবে কাজ করছে সেইভাবেই কাজ করতে বলেন। এইভাবে জাপানীরা চলে যাওয়ার পর থেকে বৃটিশের রেঙ্গুন অধিকার করার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের বাহিনী রেঙ্গুন শহরের নিরাপত্তা রক্ষা করে। আমাদের বাহিনী না থাকলে রেঙ্গুন শহরের অবস্থা যে কি ভীষণ হতো তা কল্পনাও করা যায় না। অরাজকতার সময় লুঠতরাজ, খুন-জখম এত চলে আর তাতে নিরীহ শহরবাসীদের যে কত ক্ষতি হয়, কত প্রাণহানি হয় তা স্বচক্ষে দেখেছি। যে সকল বৃটিশ অফিসার প্রথম রেঙ্গুন আসেন, তাঁরা আমাদের বাহিনীর কাজের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। শুধু রেঙ্গুনে বলেই নয়—আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়েছিল বলেই সারা পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়রা রক্ষা পেয়েছে। এই সৈন্যদল গঠিত না হলে ভারতীয়দের যে কী অবস্থা হতো তা কল্পনাও করা যায় না। একদিকে জাপানীদের হাত থেকে রক্ষা করা, অন্যদিকে সশস্ত্র দস্যুদলের কবল থেমে বাঁচানো। যুদ্ধের সময় চারিদিকেই যথেষ্ট রাইফেল ও মেসিনগান পাওয়া যেতো, দুষ্ট গ্রামবাসীরা এই সকল সংগ্রহ করে অন্য গ্রামবাসীদের ভয় দেখিয়ে লুঠতরাজ করতো। এতে যে কত প্রাণহানি হতো তার হিসাব নেই। রেঙ্গুন শহর অধিকার করার কিছুদিন পরেই বৃটিশ আমাদের বাহিনীকে একত্র জড়ো করে। প্রথমে কিছুদিন তারা শহরেই ছিল, পরে তাদের রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেল ও ইনসিন জেলে এনে ভর্তি করা হয়। অল্পসংখ্যক অন্যান্য কয়েদী ছাড়া আমাদের বাহিনীই সারা জেল অধিকার করেছে। এখানে আমাদের প্রহরীর কাজ করছে একদল বৃটিশ সেনা। চারিদিকে মেসিনগান—জেলের প্রকৃত আবহাওয়ার আস্বাদ আমার জীবনে এই প্রথম।

আমাদের হাসপাতাল ব্যারাকের প্রায় পাশ ঘেঁষেই শুরু হয়েছে জেলের উঁচু লাল প্রাচীর। বাইরের কিছুই দেখা যায় না। প্রাচীরের উপরে মাঝে মাঝে রাইফেলধারী প্রহরী। ভিতরে বেশ আমোদেই দিন কাটাতাম, ভুলে যেতাম আমরা বন্দী। কিন্তু বাহিরের দিকে তাকিয়ে যখন উঁচু পাঁচিল দেখতাম, তখন বুঝতে পারতাম—আমরা বন্দী, বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা আমাদের নাই।

বৃটিশ আমাদের আজাদ হিন্দ বাহিনীর নাম দিয়েছে JIFC. অর্থাৎ Japanese Inspired Fifth Columnist—জাপানীপ্রণোদিত পঞ্চম বাহিনী। এ নামকরণের কোনও সার্থকতা আছে কিনা জানি না। তবে বৃটিশ প্রহরীদের মুখে মাঝে মাঝে 'জিফ' কথাটা শুনে মনে হতো এদের বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আমরা পঞ্চম বাহিনীর

লোক। অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ, আমাদের নিজের গভর্ণমেণ্ট, আমাদের দেশপ্রেম সব কিছু উপেক্ষা করে দেশী ও বিদেশীর সামনে আমাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে—জাপানীর পঞ্চম বাহিনী নাম দিয়ে দেশকে জানানো হচ্ছে—এরা দেশের শত্রু। বৃটিশ প্রোপাগাণ্ডাকে বাহবা না দিয়ে উপায় নেই—এরা রাতকে দিন ও দিনকে রাত করতে পারে। এটা বৃটিশের পক্ষে নূতন নয়। ভারতবাসী বৃটিশ হাড়ে হাড়ে চিনেছে।

এখানকার জেলে আমাদের ক্যাম্প কম্যাণ্ডারের কাজ করতেন মেজর নেগি। একবার গেটের ভিতর ঢুকলেই যা কিছু বন্দোবস্ত সব আমাদেরই হাতে। বাইরে থেকে রোজই আমাদের রেশন আসতো। এখানেও রেশন বেশ ভালোই ছিল। টাটকা তরিতরকারী না থাকলেও টিনের তরকারী যথেষ্ট পাওয়া যেতো। আমি বহুদিন মেস-সেক্রেটারীর কাজ করেছি, এখানেও সেই পদে প্রতিষ্ঠিত হলাম। আমাদের তেরজন ডাক্তারের আলাদা রান্না হতো। একটু কষ্ট করে দেখাশোনা করলে বেশ উপাদেয় খাবারই তৈরী হতো। হাতে কোনও কাজ ছিল না—কাজেই সেক্রেটারীর পদ থেকে ক্রমশ রাঁধুনীর পদে আমাকেই নামতে হলো। দিনের বেশীর ভাগ সময়ই রান্নাঘরে কাটাতাম বলেই আমাদের 'লঙ্গরী'ও যত্ন নিয়ে রান্না করতো।

আমাদের সৈন্যদের বাইরে নিয়ে যাওয়া হতো 'ফেটিগের' জন্য। প্রতিদিন যতজন লোকের দরকার হতো, আগের দিন সন্ধ্যায় আমাদের অফিসারকে তা জানিয়ে দিতো। পরদিন সকালে একবেলার তৈরী খাবার নিয়ে তারা বাইরে যেতো—আবার বিকাল পাঁচটায় বা ছটায় ফিরে আসতো। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই ডকে মালপত্র ওঠানো ও নামানোর কাজ করতো, কতককে পথঘাট পরিষ্কার করার কাজেও লাগানো হতো। এরা মাঝে মাঝে আবার বেশ মারপিট করেও ফেরত আসতো। কখনো যদি কোন গোরা বা ভারতীয় অফিসার এদের গালি দিতো, এরাও ঝগড়া করে এমন কি দরকার হলে দু'ঘা বসিয়ে দিয়ে আসতো। আমাদের সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা যথেষ্ট ছিল। তারা কাজ করতে মোটেই ভয় পেতো না, কিন্তু গালিগালাজ মোটেই বরদাস্ত করতে পারতো না। যেখানে যেতো, তাদেরই বলতো—আমরা যুদ্ধে হেরে তোমাদের হাতে বন্দী হয়েছি। কাজ যা করবার আমাদের দেখিয়ে দাও, আমরা তা করবো—কিন্তু গালি বা অপমান সইবো না। কাজেই আমাদের বন্দীদেরও অপর পক্ষ সমীহ করতো। বৃটিশ পক্ষের ভারতীয় সেনাদের দেখাবার জন্যই মেজর নেগি মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে আমাদের বালসেনা দলের ছোট ছোট ছেলেদেরও ফেটিগ দলের সঙ্গে বাইরে পাঠাতেন। তাদের দেখে ও পরিচয় পেয়ে তারা আশ্চর্য হতো। বুঝতে পারতো কত বিরাট এদের প্রতিষ্ঠান।

এখানে রক্ষী দলের কাছ থেকে আমরা প্রায়ই স্টেটস্‌ম্যান ও সাউথ ইস্ট এশিয়াটিক কম্যাণ্ডের খবরের কাগজ পড়তে পেতাম। তাতে যুদ্ধের খবর থেকে সবই কিছু কিছু পাওয়া যেতো। বৃটিশ মান্দালয় থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত সোজা রাস্তা ও রেলপথ অধিকার করলেও, জাপানীদের এসব এলাকা থেকে একেবারে তাড়াতে পারেনি। জাপানীরা সোজা রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে, তারা এবার চেষ্টা করছে সিটাং নদী পার হয়ে সান স্টেটের জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নেবার জন্য। তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে রাতের আঁধারে রাস্তা ও নদী পার হতে চেষ্টা করে এবং পারও প্রায়ই হয়ে যায়। এমনিভাবে রাস্তা পার হওয়ার সময় পথের পাশে বৃটিশের কোনও আড্ডা থাকলে তা আক্রমণ করে, লুট করে। গ্রামের ভিতরে তখনও অনেক জাপানী ছিল—তাদের তাড়াবার ভার পড়েছে গুর্খা সৈন্যদের উপর। কারণ একমাত্র গুর্খা ছাড়া জাপানীদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ অন্যর পক্ষে সম্ভব নয়।

বর্মায় এখনও যুদ্ধ চলছে। জাপানীরা তাদের গেরিলা পদ্ধতিতে এখনও স্থানে স্থানে বৃটিশকে বেশ উত্ত্যক্ত করছে। রাস্তার দু'পাশে একটু দূরের বস্তীতে এখনও বহুসংখ্যক জাপানী সৈন্য রয়েছে। জাপানীদের নিজের কাছে রেশন প্রভৃতি কিছুই ছিল না, তারা গ্রাম থেকে জোর-জবরদস্তি করেই খাদ্য সংগ্রহ করতো; রাতের আঁধারে হঠাৎ তারা গ্রামে এসে হাজির হয়, সারাদিন জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে, আবার রাতে অন্য গ্রামে যায়। যেসব দলে জাপানীরা কম থাকে বা তাদের কাছে বিশেষ অস্ত্রাদি থাকে না, সুযোগ

ও সুবিধামতো বর্মীরা তাদেরও কেটে ফেলে। সারা বর্মাতেই এমনি ভাবের গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে।

জেলের ভিতরে আমাদের দিন আমোদেই কাটতো। ডাক্তার ছিলাম আমরা তেরজন, অথচ কাজকর্ম বিশেষ ছিল না। দু'জন হাসপাতালের রুগীদের দেখতো ও একজন ক্যাম্পের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য আমাদের ক্যাপ্টেন যোশী শুরু করলেন ব্যায়াম। প্রথমে সকলেই স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য আমাদের ক্যাপ্টেন যোগী শুরু করলেন ব্যায়াম। প্রথমে সকলেই তাকে 'বজরংবল্লী' নাম দিলো, কিন্তু পরে দেখা গেল সকলেই ভোর বেলা উঠে বেশ উদ্যমের সঙ্গে ডন-বৈঠক শুরু করেছে। আমাদের হেমদা এত কষ্টকর ব্যায়াম করতে রাজী নয়— কাজেই বিছানার উপর শুয়ে শুয়ে বেশ আরামদায়ক কয়েকটি নূতন ব্যায়াম আবিষ্কার করলেন। আর মল্লিকদা বেশ উৎসাহের সঙ্গে তাতে যোগ দিলেন। সকালে খানিকটা ব্যায়ামের পর চা ও জলযোগ—তারপর শুরু হলো পড়াশোনা। কেউ বা বসতো কাগজ নিয়ে, কেউ বা 'রবার্ট ব্লেক সিরিজ' নিয়ে, আর আমাদের মল্লিকদা বসতেন বিরাট 'এনাটমী' নিয়ে। মল্লিকদা গাদুগড় হাসপাতালে সার্জন ছিলেন। কাজেই এখানেও সার্জন নামে পরিচিত। আমি হেমদা, ডাঃ উদম সিং প্রভৃতি বসতাম তাস নিয়ে। সারাটা সকাল তাস পিটে তারপর খাওয়া ও ঘুম। বিকালে স্নান, চা পান, তারপর বৃষ্টি হলে বারান্দায় পায়চারি করা, বৃষ্টি না হলে জেলের ভিতরের সোজা বড় রাস্তায় খানিকক্ষণ পায়চারি করা। সন্ধ্যার পর বেশ খানিকটা আলোচনা ও হৈ চৈ। ডাঃ কানাই দাস বেশ গাইতে পারতো। তার কাছে শুনতাম বাঙলা আর মকসুদের কাছে শুনতাম পাঞ্জাবী গান। তারপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনাও হতো।

এখানে এইভাবে কিছুদিন কাটানোর পর শুনলাম, এখান থেকে আমাদের অন্য জায়গার্তে যেতে হবে। বর্মার প্রত্যেক জায়গাতে বৃটিশ তাদের এত সৈন্য সমাবেশ করেছে যে, তাদের স্থান সংকুলান আর হচ্ছে না। কাজেই জেলটি তারা অধিকার করতে চায়। জেল থেকে প্রায় চার মাইল দূরে মাঠের মধ্যে আমাদের তাঁবুতে থাকার বন্দোবস্ত হচ্ছে। জুলাই মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে নূতন আশ্রয়ে এসে উপস্থিত হলাম। চারিদিকে বেশ সুন্দরভাবে কাঁটাতারের বেড়া, চারকোণে উঁচু মঞ্চের উপরে মেসিনগান লাগিয়ে বৃটিশ প্রহরী। এক একটি তাঁবুতে ষোলজন করে থাকার জায়গা। ১৬০ পাউন্ডের তাঁবুতে ষোলজনের থাকা অসম্ভব হলেও আপাতত তাই সম্ভব করা হলো। স্নান ও অন্যান্য কাজের জন্য ক্যাম্পের ভিতরের দু'টি কুয়ো ব্যবহার করা হতো। পানীয় জল রোজই লরী করে এনে ভিতরে ট্যাঙ্কে ভর্তি করা হতো। এখানেও আমরা একইভাবে দিন কাটাতাম। এখানে সব চেয়ে সুবিধে ছিলো যে, উঁচু লাল পাঁচিল আমাদের দৃষ্টিপথের অন্তরায় হতে পারেনি। বহুদূর মাঠ ও আশপাশের ছোট ছোট বস্তীগুলি আমরা দেখতে পেতাম।

আমাদের অভিযান ব্যর্থ হওয়াতে কয়েকজন বিশেষভাবে মর্মাহত হয়। পরে তাদের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে। ব্যাংককের একজন ধনী ব্যবসায়ী এইরূপ একজন। ভদ্রলোক 'অফিসার ট্রেনিং স্কুল' থেকে পাশ করেন, কিন্তু আমাদের আত্মসমর্পণের জন্য কোনও কাজ করবার সুযোগ পাননি। তিনি রোজই আমাদের কাছে এসে অনেক কিছু বলতেন। অনেকে বিরক্ত হলেও আমরা তাঁকে অনেক বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতাম। যোশী মারাঠী ব্রাহ্মণ। তাকেই শেষে তিনি 'গুরুদেব' বলে মানতে শুরু করলেন, আর তার উপদেশে বেশী বক্তৃতা না করে, সব কিছু লিখে রাখতে শুরু করলেন। এমন কি সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত পর্যন্ত শুরু করলেন। আমার তাঁবুতে যোশী থাকতো, কাজেই প্রায় রোজই সকাল থেকে তিনি আমাদের তাঁবুতে পড়ে থাকতেন। তাঁকে শান্ত রাখার জন্য আমরাও মাঝে মাঝে একটি নূতন পন্থা অবলম্বন করতাম। তিনি এলে পরেই একটি কাগজে লিখে জানাতাম, আজ আমার মৌনব্রত। কাজেই তাঁকে চুপচাপ বসে থাকতে হতো। একজন শিখও এমনি ছিল। তবে বেশীর ভাগই গালাগালি করতো। এই রকম কয়েকজনকে আমাদের সামলাতে মাঝে মাঝে বেশ বেগ পেতে হতো।

নেতাজী যখন রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যান, সে-সময়ে তাঁর শেষ দিনের হুকুমনামা জারী

করেন। তাতে তিনি বলেন, "বিশেষ দুঃখের সঙ্গেই আমি আজ আমার সহকর্মীদের ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি। আমার প্রাণ চিরদিনই তোমাদের কাছে থাকবে। আজ অবস্থার পরিবর্তন হলেও আমাদের এই ত্যাগ, এই দুঃখকষ্ট বরণ বৃথা হবে না। যাবার আগে আমি বর্মায় অবস্থিত আমার আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রত্যেক সৈন্যকে এক পদ উচ্চ পদবী দান করছি।" তাঁর এই শেষ দিনের আদেশ মতোই আমরা সব ক্যাপ্টেন মেজর পদে উন্নীত হই। এ খবর আগে আমাদের কাছে 'জিয়াওয়াদী'তে পেঁছতে পারেনি, কিন্তু রেঙ্গুনে পেঁছানোর পর আমরা সব শুনে মেজর বলেই নিজেদের পরিচয় দিতাম।

এখানেও তাঁবুতে দিন মন্দ কাটছিল না। তবে যেদিন বৃষ্টি হতো সেদিন বেশ অসুবিধায় পড়তাম। এখানেও ভিতরের বন্দোবস্ত সব কিছু আমাদের হাতে ছিল। এখানে আসার কিছুদিন পরেই শুনলাম, আমরা হয়তো খুব শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফিরে যাবো। এখনও আমরা ভারতবর্ষে যাওয়ার পর কি অবস্থা হবে সে বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ। তবে হাজার হলেও দেশের মাটির জন্য সব অবস্থাতেই মানুষের প্রাণ কাঁদে। পরে শুনলাম, যারা বাস্তবিক রুগী নয়, অথচ স্বাস্থ্য খারাপ, তাদেরই নিয়ে যাওয়া হবে। সেই হিসাবে তাদের তালিকা তৈরী করে দেওয়া হলো। এই দলে প্রায় দু'শো জন হলো, তার মধ্যে ডাক্তার রইলাম আমরা সাতজন। বাঙালী আমি ও হেমদা।

৪ঠা আগস্ট সকালে আমাদের তৈরী হওয়ার হুকুম হলো। সকালের খাওয়া শেষ করে তৈরী হলাম। গেট থেকে বেরুবার আগে লালটুপী মিলিটারী পুলিশের কতকগুলি বৃটিশ আমাদের আর একবার তালাশী নিলো। এখানে আপত্তিকর জিনিস ছাড়াও তাদের ইচ্ছামতো জিনিস আটকে রাখতে লাগলো। দেশলাইয়ের বাক্স সকলের কাছ থেকেই নিয়ে নেওয়া হলো। অনেককে চামচ ইত্যাদি হারাতে হলো। আবার জিনিসপত্র বেঁধে তৈরী হলাম। কয়েকখানা লরী আমাদের নিয়ে একেবারে রেঙ্গুন ডকে এসে হাজির হলো। এখানে পেঁছে দেখি, রেঙ্গুন সেণ্ট্রাল জেলখানা থেকেও প্রায় দু'শো জন আমাদের আগেই ডকে এসে পেঁচেছে। কিছু দূরেই একখানা ছোট জাহাজ তৈরী ছিল। আমরা নৌকায় চড়ে জাহাজে হাজির হলাম। সন্ধ্যার অল্প পরেই জাহাজ আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলো।

জাহাজের একেবারে নীচের ডেকে আমাদের জায়গা দেওয়া হয়েছিল। যেখানে তিনশো লোকের জায়গা হতে পারে, সেখানে আমরা চারশো লোক। তার উপর ভাদ্রের গরম। প্রথমে ভিতরে ঢুকতেই মনে হলো যেন অন্ধকূপ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ভিতরের আলো নজরে পড়লো। নীচে থেকে উপরে যাওয়ার সিঁড়ির পথে ভারতীয় প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। সকাল ছটা থেকে উপরের ডেকে যাওয়া যায় বেলা বারোটা পর্যন্ত। তারপর আবার পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত মাত্র এক ঘণ্টা। এই সময়টুকু ছাড়া বাকী সময় কাটানো একেবারেই অসম্ভব। তবু নীচেই পড়ে থাকতে হতো; সেই গরমে চেষ্টা করে ঘুমানো যায় না; তাই কিছু সময় তাস খেলে কাটাবার চেষ্টা করতাম। প্রথম রাত ছিল 'ব্ল্যাক আউট'। পরদিন থেকে জাহাজে আলো জ্বলছিল। সকালে যখন উপরের ডেকে এসে বসতাম—তখন সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাসে রাতে অনিদ্রার গ্লানি কেটে গিয়ে আয়াসে চোখ বুজে আসতো। তাকিয়ে থাকতাম ঐ অসীম নীলের দিকে। পাঁচটি বছর আগে কতকটা এই সময়েই একবার সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলাম। সেদিন গৃহ ছাড়ার ব্যথা প্রাণে জেগে উঠলেও অসীম সমুদ্রের দিতে তাকিয়ে প্রাণে শান্তি পেতাম, তাই প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই তাকিয়ে থাকতাম অসীমের পানে। আজও সেই সমুদ্র—জাহাজ হেলেদুলে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে চলেছে দেশের দিকে; অথচ সে আনন্দ, সে প্রাণ কোথায়! আমরা যেন চলেছি নির্বাসিত বন্দীদল। কোথায় স্বপ্ন দেখেছিলাম—সগৌরবে স্বাধীন ভারতে পেঁছাবো, দিকে দিকে হবে জয়ধ্বনি। সে স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে; চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই পুরাতন পরাধীন ভারতবর্ষ।

বর্ষার সময় হলেও সমুদ্র বেশ শান্ত ছিল। আশঙ্কা করেছিলাম, অশান্ত সমুদ্রে খুব কষ্ট পেতে হবে; কিন্তু সমুদ্র শান্ত থাকায় বিশেষ কিছু কষ্ট পেতে হয়নি। কিন্তু নীচেকার ডেকে গরম ও বদ্ধ বাতাসে আমরা সকলেই অসুস্থতা বোধ করছিলাম। আমাদের

জাহাজখানা একাই আসছিল—পথে আরও কয়েকখানা জাহাজকে যাতায়াত করতে দেখলাম। জাহাজের খালাসী প্রায় সকলেই চট্টগ্রামের লোক। শুনলাম চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমরা কলিকাতা পেঁাছাতে পারবো। জাহাজে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। কোন রকমে এবার স্থলে নাবতে পারলে অন্ততপক্ষে একটু বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যাবে। তারপর, অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়াতে রান্নাবান্নাও প্রায় বন্ধ। কাজেই কোন বেলা দুটি জুটেছে, কোন বেলা উপবাস।

ভারতবর্ষে

এইভাবে নানা কষ্টে চারদিন কাটানোর পর ৮ই আগস্ট আমরা সকালের দিকে পৌঁছলাম ডায়মণ্ডহারবারে। ধীরে ধীরে আমাদের জাহাজ সঙ্গম পার হয়ে গঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করলো। দু'পাশে অসংখ্য জাহাজ ও নৌকার পাশ কাটিয়ে আমাদের জাহাজ শিবপুর বোটানিক্যাল বাগানের পাশ দিয়ে খিদিরপুরে এসে পৌঁছালো। তখন বেলা প্রায় পাঁচটা। দু'পাশেই পরিচিত কত জায়গা, আজ পূর্ণ পাঁচ বছর পরে দেখছি। জাহাজে যে সকল বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্য ছিল, তারা নেমে গেল। রইলো শুধু সেই দল—যারা আমাদের প্রহরীর কাজ করবে। উপরের 'পোর্ট হোল' দিয়ে দেখলাম, অল্পক্ষণ পরেই লালটুপী বৃটিশ মিলিটারী পুলিশে 'ডক' ভর্তি হয়ে গেছে। বুঝতে দেরী হলো না, আয়োজন, আড়ম্বর—সবই আমাদের অভ্যর্থনার জন্য।

পরে আমরা সারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম, এক-একজন করে নামতে লাগলাম ডকে। দু'পাশে একহাত দূরে দূরে দু'লাইন মিলিটারী পুলিশ পিস্তল ঝুলিয়ে রোষকষায়িত নয়নে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। বাইরে সারবন্দী লরী দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক লরীর পাশে উন্মুক্ত সঙ্গীনসহ রাইফেলধারী গুর্খা সৈন্যদল। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমাদের লরীতে বসিয়ে দেওয়া হলো। প্রত্যেক লরীতে ছ'জন করে গুর্খা প্রহরী। কয়েকটি রাস্তা পার হয়ে লরী একটি জায়গায় এসে থামলো—আমাদের নামতে হুকুম দেওয়া হলো। এখানে আসার পর গুর্খা ছাড়াও দেখলাম—ভারতীয় মিলিটারী পুলিশ—উঁচু পাগড়ী মাথায় দিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে একটি কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা জায়গাতে। আমরা নামার পর আবার সারি দিয়ে দাঁড়ালাম—হুকুম হলো, সঙ্গের 'মেসটিন' বার করে ডান হাতে নেওয়ার জন্য। তারপর এক-একজন করে সেই কাঁটাতার-ঘেরা জায়গায় প্রবেশ। ভিতরে ভাত-তরকারী নিয়ে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন লোক। তারা আমাদের 'মেসটিনে' ভাত ও তরকারী দিতে লাগলো। তারপর হুকুম হলো, এখানে বসে খেয়ে নাও। ক্ষিদে পেলেও মনের অবস্থা এতই খারাপ যে, ইচ্ছে করেও কিছু খেতে পারলাম না। কলের জলে টিন ধোওয়ার পর আবার হুকুম হলো, সারিবন্দী হয়ে দাঁড়াও। তারপর চারদিকে গুর্খা প্রহরী আমাদের এগিয়ে নিয়ে চললো। এবারও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া একটি জায়গাতে আমরা উপস্থিত হলাম।

এখানে বৃটিশ ও ভারতীয় মিলিটারী পুলিশ আর একবার আমাদের বেশ করে তালাশী নিলো। প্রত্যেকের জিনিসপত্র খোঁজ করে আপত্তিজনক কাগজপত্র সবকিছু আটক করা হলো। এইসব কাজ শেষ হতে প্রায় বারোটা বাজলো। একজন গুর্খা অফিসার হুকুম শোনালো, এখানেই এখন শুয়ে পড়—আবার ভোর বেলায় অন্য জায়গাতে যেতে হবে। রাতে কাঁটাতারের বাইরে অসংখ্য গুর্খা প্রহরী রাইফেল, মেসিনগান ও স্টেনার-গান সমেত পাহারা দিতে লাগলো।

ভোর প্রায় চারটের সময় আবার তৈরি হলাম। কাছেই লাইনে রেলগাড়ি। আমরা তাতেই চড়লাম। প্রত্যেক গাড়িতে দু'জন ও চারজন করে গুর্খা প্রহরী। নির্বিকার এদের মুখ। কোথায় যাচ্ছি—তাও বুঝতে পারছি না। সকাল বেলা গাড়ি চলতে লাগলো। পরিচিত দেশ, পরিচিত রেল লাইন ও পরিচিত সব স্টেশন। তবু কোথায় চলেছি, কিছুই জানি না। দমদম স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্য গাড়ি দাঁড়ালো। এখানে আমার বাড়ি। আজ সাড়ে তিন বছর বাড়ির কোনও খবর পাইনি। এত কাছে—বাড়ির প্রায় কাছ দিয়ে যাচ্ছি; অথচ কোনও খবর দিতে পারিনি! তাই প্রাণের যে কি অবস্থা তা লিখে বোঝানো যায় না। অন্যদিকের একটি গাড়িতেও প্ল্যাটফরমে 'ডেলী প্যাসেঞ্জারে'রা পান মুখে দিয়ে ছোটাছুটি করছে।

সেই পুরাতন বাঙলা দেশ, সেই ধুতিসার্ট-পরা বাঙ্গালীর দল। জানালা দিয়ে শুধু তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

বেলা প্রায় এগারটার সময় পেঁছলাম ঝিকরগাছা। আবার তেমনিভাবে দু'পাশে গুর্খারা সারিবন্দী আমাদের পাশে পাশে চললো। স্টেশন থেকে অল্প দূরেই খুব উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া জায়গা; ভিতরে কয়েকটি কুটীর। আমাদের ভিতর পর্যন্ত পেঁছে দিয়ে রক্ষীদল বিদায় নিলো। কাঁটাতার প্রায় বারো ফুট উঁচু—তার বাইরে রাইফেলধারী ভারতীয় সেনা ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে।

বছর ছ'-সাত আগে এই ঝিকরগাছাতেই সরকারী ডাক্তার ছিলাম কিছুদিনের জন্য। কিন্তু স্থান পুরাতন হলেও আবেষ্টনী সব কিছুই একেবারে নূতন। স্টেশনের কাছাকাছি বাজার থেকে শুরু করে এখানকার সব এলাকা মিলিটারী অধিকার করেছে।

আমরা যেরূপ ক্যাম্পে ঢুকলাম এগুলির নাম হচ্ছে 'খাঁচা'। এই রকম আরও অনেক-গুলি খাঁচা আছে এখানে। এক কথায় পুরা জায়গাটিই হচ্ছে একটি প্রকান্ড বন্দী-শিবির। আমাদের আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীরা ছাড়াও বৃটিশ ভারতীয় বহু বন্দী এখানে আছে। এখানে পেঁছানোর পর আবার শুরু হলো তল্লাশী। বলা বাহুল্য এখানে সকলেই ভারতীয়। তারা শুধু যে আমাদের সাধারণ তল্লাশী নিয়ে ক্ষান্ত হলো তা নয়। আমাদের সঙ্গে যা কিছু জিনিসে জাপানী গন্ধ আছে সব কিছুই তারা আটক করলো। এর মধ্যে জাপানী কাপড়, মশারি, এমন কি কম্বল পর্যন্ত। তারপর যে জিনিসটি তাদের পছন্দসই তা'ও আটক হলো। এর মধ্যে বিছানার চাদর, সিভিলিয়ান জামা-কাপড়, হাসপাতালের বড় কম্বল সব কিছু। এর আগে এসব জিনিসে কেউ হাত দেয়নি। এখানকার ভারতীয়দের ব্যবহার মোটেই প্রশংসনীয় নয়। এর আগে গুর্খারাও প্রহরীর কাজ করেছে। তারা শুধু হুকুম তামিল করেছে ঠিকভাবে, তা'ছাড়া নিজেরা কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি। কিন্তু এখানকার ভারতীয় সেনারা 'ধরে আনতে বললে—বেঁধে আনে'—এই নীতি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছে।

ক্যাম্পের ভিতরে যে ক'টি কুটীর ছিল, তা আমাদের চারশো জনের পক্ষে পর্যাপ্ত না হলেও তাতেই কোন রকমে স্থান সংকুলান করতে হলো। তারপর প্রতি মিনিটে হুকুম জারী হতে লাগলোঃ ঘরদোর শীঘ্র পরিষ্কার করে নাও। খাওয়া এগারোটার মধ্যে সারা চাই। খাওয়ার পর চল্লিশজন কাঠ আনতে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে খাওয়া ও ঔষধ-পত্রের বন্দোবস্ত মোটেই আশাপ্রদ নয়। তবে আমরা সব কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি, কাজেই অভিযোগ আমাদের কিছুই ছিল না।

আমরা পেঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি জমাদার ও সুবেদার সাহেব আমাদের নামের লম্বা চওড়া তালিকা প্রস্তুত করলেন। তারপর হুকুম হলো কাল থেকে একটি করে ফর্দ আসবে, তাতে যাদের নাম থাকবে তারা যেন অফিসে হাজিরা দেয় সকাল নটার সময়। এবার থেকে শুরু হলো জিজ্ঞাসাবাদ। বিরাট অফিস, তাতে ছোট এক একটি ঘরে এক একজন ভারতীয় অফিসার—কাগজের তাড়া ও কালি-কলম নিয়ে তৈরী হয়ে আছেন।

প্রত্যেক অফিসার প্রতিদিন প্রায় দশ-বারো জনকে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করে সবকিছু লিখে রাখতে লাগলেন। আমাদেরও পালা এল। অফিসারের বেলায় কড়াকড়ি একটু বেশী। সকালে একজন নায়ক আমাদের নিয়ে যেতো সঙ্গে করে, আবার বেলা প্রায় বারোটায় ফিরিয়ে আনতো ক্যাম্পে। আবার খাওয়ার পর বেলা দুটোয় সেখানে নিয়ে যেতো।—আবার পাঁচটায় ফেরত আনতো।

আমাদের দরকারী ও অদরকারী বহু প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করা হলো। দশদিন এখানকার ক্যাম্পে ছিলাম। অন্য ক্যাম্পে যারা ছিল তাদের সঙ্গে দেখা করা বা কথাবার্তা বলার কোনও সুযোগ আমাদের ছিল না। দশদিন পরে খবর এল—আমি, ডাঃ হেম মুখার্জি ও ডাঃ উদম সিং প্রায় সত্তরজন নার্সিং সিপাহীসহ লক্ষ্ণৌ-এর ডিপোতে ফিরে যাবো। সকাল থেকেই হুকুমের পর হুকুম জারী হতে লাগলো। চারটের সময় ক্যাম্প থেকে বাইরে এলাম। সেখানে আরও একবার তল্লাশী নেওয়া হলো। তারপর পথখরচ হিসাবে প্রত্যেকে

পেলাম ছ'টাকা করে। অর্থাৎ প্রতিদিন দু'টাকা হিসাবে তিন দিনের পথখরচ। সন্ধ্যার পর গাড়ির পাশ প্রভৃতি তৈরী করে আমাদের স্টেশনে পেঁছে দিলো। রাত দু'টোয় কলিকাতায় যাওয়ার গাড়ি। আমরা প্ল্যাটফর্মের উপর এসে শুয়ে পড়লাম। স্টেশনে একটি পান-বিড়ির দোকান ছিল। সেখানে 'সুভাষ মার্কা' বিড়ি বিক্রী হচ্ছিল। বিড়ির বাণ্ডিলের উপর সুভাষচন্দ্রের ছবি। আমাদের সঙ্গের বহু লোকের কাছেই নেতাজীর ছবি ছিল, কিন্তু তা আগেই কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কাজেই সুভাষচন্দ্রের এই ছবি পাওয়ার জন্য প্রত্যেকে চেষ্টা করতে লাগলো। দোকানের বিড়ি সব মুহূর্তের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। দোকানদার বাঙ্গালী। তার সঙ্গে বসে বসে খানিকক্ষণ গল্প করলাম। সে আমাকে জানালে, প্রত্যেকে এই সুভাষচন্দ্রের ছবির জন্য লালায়িত; তারা বিড়ি না পেলেও শুধু ছবিটাই চায়। অনেকে ছবি নেওয়ার পর মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম করে। তাকে জানালাম—এরা সকলেই হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈন্যদল। নেতাজীকে এরা প্রকৃত দেবতার মতোই শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। তাঁর একটি ছবি সঙ্গে রাখতে পারলে এরা নিজেকে ধন্য মনে করে। সমস্ত জিনিসপত্রই আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে—কাজেই নেতাজীর কোন ফটো এদের কাছে নেই।

রাত প্রায় দু'টোর সময় গাড়িতে চড়ে বসলাম। এখান থেকেই আমরা কতকটা মুক্ত। সঙ্গে কোনও প্রহরী নেই। ভোর বেলায় শিয়ালদা' এসে পেঁছলাম। আগে থেকেই কতকগুলি লরী প্রস্তুত ছিল। তারা আমাদের নিয়ে প্রথমে উপস্থিত হলো হাওড়ার কাছাকাছি একটি ক্যাম্পে। কিন্তু সেখানে স্থানাভাব। কাজেই সেখান থেকে একেবারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে একটি ক্যাম্পে আমাদের নামিয়ে দিলে। এটি একটি 'রেস্ট ক্যাম্প'। অনেকে এখানে রেঙ্গুন যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। জায়গা খোঁজা, জলের বন্দোবস্ত এসব করতে করতেই দিন কেটে গেল। শুনলাম আজ আমাদের যাওয়া সম্ভবপর হবে না।

পরের দিন সকালে খবর নিয়ে শুনলাম আজ হয়তো যাওয়া হতেও পারে। যদি যাওয়া হয় তো বেলা চারটেয় আমরা খবর পাবো। হেমদা আমাকে একবার বাড়ি থেকে ঘুরে আসার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। সাড়ে তিন বছর বাড়ির কোনও খবর পাইনি। আজ বাড়ি গেলেও থাকবার উপায় নেই। কাজেই আমি ভাবলাম, একেবারে লক্ষ্মৌ থেকে ফিরে এসেই বাড়ি যাবো। কিন্তু শেষকালে অনেক ভেবে বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আবার দেখলাম আমার চিরপরিচিত কলিকাতা শহর। যুদ্ধের বাজারে এখানেও এসেছে অনেকখানি পরিবর্তন। 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল' হয়তো অনেক দুঃখে ও লজ্জায় কালো রঙে মুখ ঢেকেছে। সারা ময়দান ছড়িয়ে শুধু মিলিটারী ক্যাম্প! ট্রামে চড়ে বসলাম। দুপুরে পেঁছলাম আমার বাড়ি—দমদমে।

বহুদিন পরে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে মিলনক্ষণটুকু যে কত মধুর, কত আনন্দময় তা শুধু যাদের জীবন কেটেছে দীর্ঘ প্রবাসে, তারাই উপভোগ করতে পারে। অনেকে আমাকে মৃতের কোঠায় ফেলে রেখেছিলেন। মাত্র দু'ঘণ্টা বাড়িতে ছিলাম। তারপর ফিরে এলাম ক্যাম্পে প্রায় সাড়ে চারটের সময়। শুনলাম আজই লক্ষ্মৌ যেতে হবে। তৈরী হয়ে নিলাম। সন্ধ্যায় কতকগুলি লরী আমাদের হাওড়া স্টেশনে পেঁছে দিলো। রাত দশটায় এখান থেকে মিলিটারী স্পেশ্যাল আমাদের নিয়ে দীর্ঘ পথে পাড়ি জমালো। বাড়ি থেকে আসার সময় কিছু টাকা সঙ্গে এনেছিলাম, কাজেই পথে খাওয়া-দাওয়া বেশ হলো।

সারারাত—পরের দিন—এমনিভাবে গাড়িতেই কাটলো। পরের দিন ভোরে আমরা লক্ষ্মৌ পেঁছলাম। এখান থেকে পেঁছলাম আমাদের পুরাতন পরিচিত 'ট্রেনিং সেণ্টারে'। এখানে আস্তে আস্তে পরিচিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর কয়েকজন ডাক্তার এসে পেঁছলেন। ডাঃ বীরেন চক্রবর্তী ও ডাঃ দেবেন গাঙ্গুলী আমাদের আগেই এসে পেঁচেছেন। ক্রমে আমরা সবসুদ্ধ সতেরজন ডাক্তার ও প্রায় সাতশো নার্সিং সিপাহী জমা হলাম। আমরা একটি ব্যারাকে আলাদা থাকতাম। কাজকর্ম ছিল না, কাজেই দিন কাটতো তাস খেলে আর ঘুমিয়ে। শুনলাম এখানেও আমাদের আবার কিছু জিজ্ঞাসাবাদ প্রভৃতি হবে। এখানে এসে খবরের

কাগজে দেখলাম—ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর জন্য সারা দেশে বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

নভেম্বর মাসের শেষাশেষি আমাদেরও এখানে একটি 'কোর্ট মার্শাল' শুরু হলো। তার আগেই কাগজে গভর্ণমেণ্টের নীতি বেরিয়েছে। তাতে লেখা ছিল—ডাক্তার প্রভৃতিদের কিছু সাজা দেওয়া হবে না। এখানে মাত্র কয়েকটি বাঁধা প্রশ্ন আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়। তারপর শুনলাম, আমাদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হবে। টাকা-পয়সাও কিছু পাওয়া যাবে না।

৪ঠা ডিসেম্বর এখান থেকে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত রেলের পাশ দেওয়া হলো। আমরা এদিকের ছিলাম মাত্র পাঁচজন। ক্যাপ্টেন ইলিয়াস পাটনায় নেমে গেলেন। আমি, হেমদা, দেবেন ও বীরেন চক্রবর্তী একেবারে সোজা হাওড়ায় নামলাম। এঁরা তিনজন ঢাকায় যাবেন, আমি সোজা বাড়ি ফিরে এলাম। শেষ হলো বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ নানা দুঃখকষ্টের জীবন।

কয়েকটি তথ্য

নেতাজী মালয়ে আসার আগে পূর্ব এশিয়ার ইন্ডিয়ান ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স লীগের সভাপতি ছিলেন রাসবিহারী বসু।

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে সিঙ্গাপুর শহরে অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয়।

নেতাজী মালয়ে আসার পর ও স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার পর নেতাজী পূর্ব এশিয়ার ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স লীগের সভাপতি, আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাপতি হন।

নেতাজী কোন প্রকার Rank বা পদবী ব্যবহার করতেন না। দিনরাত সর্বদাই তিনি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। রাতে মাত্র এক ঘণ্টা বা দু'ঘণ্টা বিশ্রামের সময় পেতেন।

জাপানী গভর্ণমেণ্ট নেতাজীকে একটি বিমান উপহার দেয় সর্বদা ব্যবহারের জন্য।

জাপানী গভর্ণমেণ্ট আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্টকে উপহার দেওয়ার পর মেজর জেনারেল লোগানন্দন সেই দ্বীপপুঞ্জে গভর্ণর হন। আন্দামান ও নিকোবর যথাক্রমে স্বরাজ ও শহীদ দ্বীপ নামে অভিহিত হয়।

বাঙলার দুর্ভিক্ষের খবরে নেতাজী বিশেষভাবে ব্যথিত হন। তিনি দশ লক্ষ টন চাল পাঠাবার জন্য প্রতিশ্রুত হন। বার বার বেতার মারফত এ খবর ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ পক্ষ একেবারেই নীরব থাকেন।

মেজর জেনারেল চ্যাটার্জি ভারতের অধিকৃত অঞ্চলের গভর্ণর নিযুক্ত হন।

কর্নেল ভোঁসলে, কর্নেল চ্যাটার্জি, কর্নেল কিয়ানী ও কর্নেল লোগানন্দন আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বপ্রথম মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন।

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ও ফৌজ গঠনের ইতিহাস

১৯৪১ সালের ৮ই ডিসেম্বর মালয়ের যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকেই বহু ভারতীয় সেনা জাপানীদের হাতে বন্দী হয়। ক্যাপ্টেন মোহন সিং নামে একজন ভারতীয় অফিসার মিত্রার কাছাকাছি যুদ্ধারম্ভের কয়েকদিন পরেই জাপানীদের হাতে ধরা পড়েন। যুদ্ধের সময় যে সকল ভারতীয় সেনা জাপানীদের কাছে ধরা পড়ে, জাপানীরা তাদের প্রকৃতরূপে বন্দী করেনি। অনেকেই জাপানীদের সাথে সাথে পুলিশের কাজ প্রভৃতিতে নিযুক্ত হতো। এই সকল ভারতীয়দের একত্র করে ক্যাপ্টেন মোহন সিং একটি দল গঠন করেন। জাপানীরা যখন সারা মালয় জয় করে সিঙ্গাপুর আক্রমণ করে, তখন এই ভারতীয় দল তাদের যথেষ্ট সাহায্য করে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সিঙ্গাপুরে বৃটিশ পক্ষ থেকে জেনারেল পারসিভ্যাল জাপানী সেনাপতি জেনারেল ইয়ামাসিতার কাছে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণের পর জাপানীর পক্ষ থেকে মেজর ফুজিয়ারা সমস্ত ভারতীয় বন্দীদের ভার ক্যাপ্টেন মোহন সিংএর হাতে তুলে দেন। তখন মোহন সিং তাঁর সাথীদের নিয়ে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' অর্থাৎ আজাদ হিন্দ ফৌজের ভিত্তি গঠন করেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত সরকারীভাবে এ ফৌজ গঠন করা হয়নি, অথবা সরকারীভাবে জাপানীরা এ ফৌজ মেনে নেয়নি।

পরে জাপানীদের পক্ষ থেকে মেজর ফুজিয়ারা মালয়ের সমস্ত বড় বড় ভারতীয়দের এক সভা আহ্বান করেন। সেই সভাতে তিনি ভারতীয়দের একত্র করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করতে বলেন, এবং এ চেষ্টাতে জাপান সর্বতোভাবে ভারতীয়দের সাহায্য করার জন্য বদ্ধপরিকর একথা জানান। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ভারতীয়েরা জাপানীদের সদিচ্ছা সর্বতোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি, কারণ বেশ ভালোভাবে জাপানীদের মনোভাব জানতে না পেরে জাপানীদের সাহায্য করলে হয়তো বৃটিশের পরিবর্তে জাপানীদের ভারতে কায়েম করা হবে, এই ভয় সকলের অন্তরে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, কাজেই তাঁরা বেশ ভেবেচিন্তে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে চাইলেন। এইসময় টোকিও থেকে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বসু সেখানে ভারতীয়দের একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভায় যোগদান করার জন্য তিনি মালয় ও শ্যামদেশ থেকে ভারতীয় প্রতিনিধিদের আহ্বান করেন। একটি প্লেন টোকিও যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় পড়ে, তাতে শ্যামদেশের স্বামী সত্যানন্দ, প্রিতম সিং প্রভৃতি চারজন ভারতীয় মারা যান। ২৮শে থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত টোকিওতে শ্রীযুত রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে ভারতীয়দের এই সভা হয়। এই সভায় জাপান, চীন, মালয় ও শ্যামদেশ থেকে বহু ভারতীয় প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় স্থির হয় যে (১) ভারতীয়েরা 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগ' নামে একটি সরকারী দল গঠন করবেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা। এই স্বাধীনতার অর্থ বিদেশীর কোন প্রকার অধিকার ভারতের উপর থাকবে না। (২) আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে ভারতীয়দের একটি সেনাবাহিনী গঠন করা হবে। (৩) জুন মাসে ব্যাঙ্কক শহরে পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বে একটি সভা আহ্বান করা হবে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ২০শে থেকে ২৩শে জুন পর্যন্ত ব্যাঙ্ককে সর্বভারতীয়দের একটি সভা হয়। এই সভায় জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচীন, হংকং, বর্মা, মালয় ও শ্যামদেশ থেকে প্রায় একশজন প্রতিনিধি যোগদান করেন। ভারতীয় যুদ্ধবন্দী শিবির থেকেও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সভায়—(১) সরকারীভাবে ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। এর আদর্শ হবে—একতা, বিশ্বাস ও বলিদান। একতা—জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়দের মাত্র একটিই প্রতিষ্ঠান। বিশ্বাস—শীঘ্রই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার উপর অখণ্ড বিশ্বাস। বলিদান—

স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব—প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন। (২) আজাদ হিন্দ ফৌজ নামে সেনাদল গঠন করা হবে। এই সেনাদলের উপর আধিপত্য করবে, "সমর পরিষদ" (council of action), জাপানী সেনাদলের সমপর্যায়ে এই সেনাদল গঠিত হবে, এবং স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সেনাবাহিনী হিসাবে এদের মেনে নিতে হবে। এই সেনাবাহিনী সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত হবে, আর শুধু ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীনতা কায়েম রাখার জন্যই এই সেনাবাহিনী ব্যবহৃত হবে, অন্য কোনও কাজে নয়। (৩) একজন সভাপতি ও চারজন সভ্য নিয়ে সমর পরিষদ গঠিত হবে। চারজন সভ্যের মধ্যে দু'জন সেনাদলের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন। প্রথম সমর পরিষদ এইরূপে গঠিত হয়ঃ সভাপতি—রাসবিহারী বসু; সভ্যগণ—এন. রাঘবন; কে. পি. কে. মেনন; ক্যাপ্টেন মোহন সিং ও কর্নেল জি. কিউ. গিলানী। (৪) ভারতীয়দের জাপানীরা শত্রুজাতি হিসাবে গণ্য করতে পারবে না। এবং কোনও ভারতীয়ের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারবে না। (৫) ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পতাকা জাতীয় পতাকা হিসাবে গ্রহণ করা হবে। (৬) সুভাষচন্দ্র বসুকে বার্লিন থেকে পূর্ব এশিয়ায় নিয়ে আসার জন্য জাপানীদের অনুরোধ করা হবে।

তারপর রাসবিহারী বসু মহাশয় আসেন এবং ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লীগের কাজ পূর্ণভাবে চলতে থাকে। চারদিকে লীগের শাখা খোলা হয়, আর ভারতীয়দের একত্র করা হয়। ফৌজের তরফ থেকে মোহন সিং-এর নেতৃত্বে বন্দী শিবির থেকে বহু ভারতীয় সেনা সেনাদলে যোগদান করে। তাদের রীতিমতো সামরিক শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। এইভাবে চারিদিকে কাজ শুরু হয়।

বহু সিভিলিয়ান লীগের সভ্য হন এবং যেখানে যেখানে ভারতীয়েরা আছেন সেখানেই লীগের শাখা খোলা হয়। পেনাঙে স্বরাজ ইনস্টিটিউট নামে একটি শিক্ষা-শিবির খোলা হয় এবং বহু যুবককে সেখানে শিক্ষা দেওয়া হতো। একদিন রাতে কয়েকজন উচ্চপদস্থ জাপানী অফিসার সেখানে উপস্থিত হন এবং কয়েকজন স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত যুবককে লরীযোগে স্থানান্তরিত করেন। এই ব্যাপারে বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি হয়, এবং জাপানীরা জানায় যে, পঞ্চম বাহিনীর কাজ করার জন্যই এই সকল যুবককে সাবমেরিন-যোগে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হয়েছে। লীগের তরফ থেকে জাপানীদের এই স্বেচ্ছাচারপূর্ণ কাজের জন্য তীব্র প্রতিবাদ করা হয়—যেহেতু সমর পরিষদের বিনা অনুমতিতে জাপানীদের ভারতীয়দের কোনও কাজে হস্তক্ষেপ করার কোনও ক্ষমতা ছিল না। প্রতিবাদ হিসাবে সমর পরিষদের প্রত্যেকেই পদত্যাগ করেন। এই ব্যাপার ক্রমে জটিল হয়ে পড়ে। ক্যাপ্টেন মোহন সিং জাপানীদের কাজের তীব্র প্রতিবাদ করার জন্য জাপানীরা তাঁকে বন্দী করে। জাপানীদের এই ব্যবহারে ভারতীয়রা জাপানীদের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করে। প্রত্যেকেই ধারণা করে যে, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার সুযোগদান জাপানীদের মিথ্যা কথা। রাসবিহারী বসু মীমাংসার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পরে তিনি শেষ চেষ্টারূপে টোকিওতে জাপানের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল তোজোর সঙ্গে দেখা করতে যান। টোকিও যাওয়ার আগে ভারতীয়দের নূতন কোনও গোলযোগের সৃষ্টি হলেও বাহিরে কাজ ঠিক মতোই চলছিল, এবং অনেকেই ভিতরের সব খবর জানতে পারেনি। মোহন সিংকে বন্দী করার পর যুদ্ধবন্দী শিবির থেকে যাঁরা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করেছিলেন—তাদের মধ্য থেকে অনেকেই আবার বন্দী শিবিরে ফিরে যান।

এর পর জাপানীদের সঙ্গে আর কিছু গোলযোগ হয়নি। জুন মাসের বিশ তারিখে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর টোকিওতে আগমনের সংবাদ পাওয়া যায়। এই সংবাদে প্রত্যেকেই বিশেষ আনন্দিত হয় এবং বুঝতে পারে যে, এইবার জাপানীদের সঙ্গে একটা পাকাপাকি বোঝাপড়া নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। ২১শে জুন টোকিও থেকে সুভাষচন্দ্র বেতারে একটি বক্তৃতা দেন।

২রা জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্র বসু বিমানযোগে সোনানে (সিঙ্গাপুর) উপস্থিত হন। সেদিন তাঁকে সংবর্ধনা করার জন্য গণ্যমান্য বহু ভারতীয় বিমানঘাঁটিতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আগমনের সংবাদ সারা মালয়ে যেন আগুনের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সোনানে

ও সারা মালয়ে যেন উত্তেজনার একটা বিরাট ঢেউ বয়ে যায়। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেকের মুখে একই কথা, একই আলোচনা—সুভাষবাবু পেঁছে গেছেন, আর কোনও চিন্তার কারণ নাই। এদিককার প্রায় সকলেই শুধু তাঁর নাম ও কার্যাবলীর সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ছিলেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে পূর্বে পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। কাজেই তাঁর দীর্ঘ সুন্দর দেহ, হাস্যোজ্জ্বল প্রসন্ন মুখ দেখে অন্তর থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এবার আমরা যোগ্য নেতা পেয়েছি—যিনি আমাদের পরিচালিত করবেন স্বাধীনতার যুদ্ধে। সুভাষচন্দ্র মালয়ে এসে পেঁছানোর পরই, শ্রীরাসবিহারী বসু ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্‌ডেন্স লীগের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং সুভাষচন্দ্র সেই পদ গ্রহণ করেন। প্রথম প্রথম লীগের কাছে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা এসেছিল—ক্রমে ক্রমে তাঁর নেতৃত্বে সে সব দূর হয়ে গেল। একবার একজন তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'যদি জাপানীরা আমাদের সঙ্গে কপটতা করে তবে তার ফল কিরূপ হবে?' উত্তরে তিনি বলেন, 'আশা করি আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন। আমরা যদি একতাবদ্ধ না হই—আমরা যদি আমাদের সেনাদল গঠন না করি—তবেই জাপানীরা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। আমাদের সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। বৃটিশ, জাপান, এমন কি আমাদের নিজেদের মধ্যেও প্রত্যেকের উপর প্রতি পদে নজর রাখতে হবে।'

৫ই জুলাই তারিখে সোনানে টাউন হলের সামনে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সৈন্যদের কুচকাওয়াজ উপলক্ষে তিনি বলেন—"আজ হচ্ছে আমার জীবনের সব চাইতে গৌরবময় দিন। আজ আমাদের জাতীয় সৈন্যদল গঠন করে জগতের সমক্ষে ঘোষণা করবার সুযোগ পেয়েছি। প্রত্যেক ভারতবাসীর এই বাহিনীর জন্য গর্ববোধ করা উচিত। এটি তাদের নিজস্ব ভারতীয় বাহিনী—শুধু ভারতীয়ের নেতৃত্বে এই বাহিনী গঠিত হয়েছে এবং যখন সুযোগ আসবে তখন শুধু ভারতীয়ের নেতৃত্বেই এই বাহিনী রণক্ষেত্রে অগ্রসর হবে।

"১৯৩৯ সালে জার্মানী যখন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন জার্মান সেনাদলের কণ্ঠে শুধু এই ধ্বনি ছিল—'প্যারিস চলো' 'প্যারিস চলো'। ১৯৪১ সালের অভিযানে জাপানী সেনাদলের কণ্ঠেও একই কথা, 'সিঙ্গাপুর চলো'! হে আমার সতীর্থগণ, আমার সেনাদল—আজ তোমাদেরও রণধ্বনি হোক—'দিল্লী চলো', 'দিল্লী চলো'। এই স্বাধীনতার যুদ্ধে শেষ অবধি আমরা কতজন বেঁচে থাকবো তা জানি না, তবে এইটুকু জানি চরম জয়লাভ আমাদেরই হবে। যতদিন পর্যন্ত আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যের কবরস্থান পুরাতন দিল্লীর লাল কেল্লায় আমাদের বিজয় উৎসব সম্পন্ন না করছি ততদিন পর্যন্ত আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না। বহুদিন পূর্ব থেকেই আমি বিশেষভাবে বুঝতে পেরেছি যে, অন্য সব বিষয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হলেও একটি বিষয়ে আমাদের অভাব আছে—সেটি হচ্ছে আমাদের জাতীয় সেনাদলের অভাব। সেনাদল ছিল বলে জর্জ ওয়াশিংটন সংগ্রামের দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করেছিলেন—গ্যারিবল্ডীর সঙ্গে সশস্ত্র সেনাদল ছিল বলেই তিনি ইতালীকে স্বাধীন করতে পেরেছিলেন। তোমরাও জাতীয় বাহিনী গঠনের সুযোগ-সুবিধা পেয়েছো। এমন ব্রতের পুরোভাগে তোমরা—অগ্রদূত তোমরা—এজন্য সুখী হও, গর্ববোধ করো।"

৬ই জুলাই তারিখে জাপানের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল তোজো জাতীয় সেনাবাহিনীকে সম্মান প্রদর্শন করেন। সেদিন উচ্চ মঞ্চের উপর নেতাজী ও তোজো পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন। পুরো দেড় ঘণ্টা ধরে আমাদের সৈন্যরা অভিবাদন করে—তাঁরা 'সাবধান' হয়ে সেই অভিবাদন গ্রহণ করেন।

৯ই জুলাই তারিখে পাডাঙে একটি সভা হয়। এই সভায় প্রায় লক্ষাধিক ভারতবাসী যোগদান করেন। সেদিন তাদের মধ্যে যে বিরাট উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল সাধারণত তা দেখা যায় না। তারা যেন তাঁকে দেখবার ও তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য পাগল হয়ে ছুটে এসেছে। এই সভায় তিনি দীর্ঘসময় বক্তৃতা করেন। তিনি কেন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে বিপদসঙ্কুল পথে পা বাড়িয়ে আজ এখানে ছুটে এসেছেন, আমাদের কি করা কর্তব্য

প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করেন। পরে বলেন—'আপনারা আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আমার দেশের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করতে পারি একথা আমার অতি বড় শত্রুও বিশ্বাস করতে পারবে না। আজ আপনাদের সামনে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আজাদ হিন্দ ফৌজ দেখতে পাচ্ছেন। বন্ধুগণ! পূর্ব এশিয়াবাসী তিরিশ লক্ষ ভারতীয়ের কণ্ঠে আজ শুধু ধ্বনি উঠুক যে, সর্বস্ব ত্যাগ করেও আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এই সমর আয়োজনের জন্য আমি আশা করছি যে অন্তত তিন লক্ষ সৈন্য ও তিন কোটি ডলার অর্থ সংগ্রহ করতে পারবো। মৃত্যুবিজয়ী একটি নারী-বাহিনীও গঠন করতে চাই—তেজস্বিনী নারীদের নিয়ে। ১৮৫৮ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ যে তরবারি ধারণ করেছিলেন, বর্তমান সংগ্রামে এই নারী-বাহিনী পুনরায় সেই তরবারি ধারণ করবেন।'

বহু সিভিলিয়ান সৈন্যশ্রেণীতে যোগদান করার জন্য আবেদন করে। তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কয়েকটি শিবির খোলা হয়। সাইগন, সেরেমবান, ইপো প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি কেন্দ্র হয়। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা এত বেশী হয় যে, শিবিরে তাদের সকলকে স্থান দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। এতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের লোক থাকলেও বেশীর ভাগই ছিল মাদ্রাজের। বহু সিভিলিয়ান তাদের সর্বস্ব লীগকে দান করে স্ত্রীপুত্রসহ স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চুম্বকের আকর্ষণের মতোই সুভাষচন্দ্রের সাথী হয়ে দেশমাতৃকার মুক্তিকামনায় সহস্র সহস্র ভারতবাসী ছুটে আসে তাদের সর্বস্ব পণ করে।

১৫ই আগস্ট তারিখে নেতাজী ফেয়ারার পার্কে একটি সভায় বক্তৃতা করেন। প্রায় তিরিশ হাজার ভারতবাসী সেদিন সেখানে উপস্থিত হয়েছিল তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য। তিনি বলেন—"বৃটিশকে 'ভারত ত্যাগ করো' এই দাবী করার জন্য এক বছর পূর্বে মহাত্মা গান্ধীকে কারারুদ্ধ করা হয়। তারপর থেকেই দেশে প্রবল আন্দোলন চলতে থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও আজও আমরা স্বাধীনতা পাইনি।" এই সভায় তিনি আরও বলেন, "খুব শীঘ্রই আমাদের নবগঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজ বর্মা এবং সেখান থেকে ভারতের দিকে অগ্রসর হবে। কাজের সুবিধার জন্য আমরা আমাদের ইণ্ডিপেনডেন্স লীগের হেডকোয়ার্টারও খুব শীঘ্রই রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করবো।"

১৯৪৩ সালের ২৫শে আগস্ট থেকে তিনি আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাহ্সালার অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। সেদিন তিনি আনন্দের সঙ্গে বলেন—"ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আন্দোলন ও আজাদ হিন্দ ফৌজকে সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য আমি ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করলাম। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সৈনিক হওয়ার চাইতে বড় সম্মান ও গৌরবের অন্য কিছু নাই। আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর সেবক হিসাবেই আমি নিজেকে গণ্য করি। আমি আমার কর্তব্য এমন ভাবেই সম্পাদন করবো যার দ্বারা আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীর বিন্দুমাত্র ক্ষতি না হয় এবং যার দ্বারা প্রত্যেক ভারতবাসী আমার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে পারেন। আমাদের কর্তব্য বড় কঠিন। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্যের উপর আমার গভীর আস্থা আছে। আটত্রিশ কোটি ভারতবাসী অর্থাৎ পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ জাতির স্বাধীন হবার পূর্ণ অধিকার আছে। আর আজ তারা সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সবকিছু মূল্য দিতে প্রস্তুত। কাজেই আমাদের জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবার কোনও শক্তি পৃথিবীতে নাই। সহকর্মিগণ! আমাদের কাজ শুরু হয়েছে, 'চলো দিল্লী' ধ্বনিসহকারে চলো আমরা এগিয়ে যাই।—"

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর অস্থায়ী আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের (Provisional Government of Free India) প্রতিষ্ঠা

বেলা সাড়ে দশটায় ডাই তোয়া গেকিজোতে পূর্ব এশিয়ার সকল স্থানের লীগের পূর্ণ প্রতিনিধিত্বে এই সভার অধিবেশন হয়। বহু ফৌজী অফিসারও উপস্থিত ছিলেন। এইদিন নেতাজী প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। যখন তিনি শপথ গ্রহণ করেন তখন তিনি এতই ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন যে, কিছুক্ষণ কোনও বাক্যস্ফুরণ হয়নি। পরে তিনি নিজ স্বভাবসিদ্ধ ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন—"আমি সুভাষচন্দ্র ভগবানের নামে পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে, ভারতবর্ষ এবং আমার আটত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে স্বাধীন করার জন্য আমার জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমি পবিত্র স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যাবো।—" সেদিন তিনি যে আবেগময়ী বক্তৃতা দেন, তার তুলনা হয় না। —"বিদেশে ভারতীয়েরা চেতনা লাভ করে একটি প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হয়েছে। তাদের সম্মুখে রয়েছে ভারতের আজাদী ফৌজ, তাদের মুখে একই কথা—'চলো দিল্লী'।

"পূর্ব এশিয়ার ইণ্ডিপেনডেন্স লীগ আজাদ হিন্দ ফৌজের অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠন করেছেন। এখন আমরা পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে অবতীর্ণ হচ্ছি। ঈশ্বরের কাছে আজ প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের সাফল্য এবং মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আমাদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন। দেশমাতৃকার মুক্তি দেশের মঙ্গল, বিশ্বের দরবারে তাঁকে উন্নীত করবার জন্য আমরা জীবন পণ করছি।

"অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ভারতীয়ের আনুগত্য দাবী করে। এবং এই গভর্ণমেণ্ট আনুগত্য লাভের যোগ্য। এই গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ভারতবাসীকে ধর্মের স্বাধীনতা এবং সমস্ত অধিবাসীর জন্য সমান অধিকার ও সমান সুযোগ-সুবিধার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে—"

প্রথম গভর্ণমেণ্ট এই ভাবে গঠিত হয়ঃ—

(১) সুভাষচন্দ্র বসু—প্রধান মন্ত্রী (সমর ও বৈদেশিক বিভাগ)
(২) ক্যাপ্তেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন (মহিলা বিভাগ)
(৩) এস. এ. নায়ার (প্রোপাগান্ডা)
(৪) লেঃ কর্নেল এ. সি. চাটার্জি (ফাইনান্স)
(৫) " " আজিজ আহমদ (ফৌজের প্রতিনিধি)
(৬) " " এন. এস. ভগত "
(৭) " " জে. কে. ভোঁসলে "
(৮) " " গুলজারা সিং "
(৯) " " এম. জেড. কিয়ানী "
(১০) " " এ. ডি. লোগানন্দন "
(১১) " " ইসান কাদের "
(১২) " " শাহ নওয়াজ "
(১৩) এ. এম. সহায়—সেক্রেটারী
(১৪) রাসবিহারী বসু—প্রধান উপদেষ্টা
(১৫) করিম গণি, দেবনাথ দাস, ডি. এম. খান, এ. ইলেপা, জে. থিভি, সর্দার ঈশ্বর সিং—উপদেষ্টা
(১৬) এ. এন. সরকার—আইন উপদেষ্টা

২৩শে অক্টোবর তারিখে জাপান গভর্ণমেণ্ট আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে মেনে নেয় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে।

২৫শে অক্টোবর তারিখে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট বৃটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

এর পর চীন, মানচুকু, ইতালী, জার্মানী, ফিলিপাইন, শ্যাম ও বর্মা, আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে মেনে নেয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে।

নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে জেনারেল তোজো আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে দান করেন। নেতাজী ঐ দ্বীপ দুইটির নূতন নামকরণ করেন—শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ। কারণ ঐ দ্বীপে বহু দেশভক্তকে অশেষবিধ ক্লেশ ও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে।

১৮ই মার্চ তারিখে আজাদ হিন্দ ফৌজ সর্বপ্রথম সীমান্ত পার হয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রবেশ করে।

৪ঠা জুলাই, ১৯৪৪। ঠিক একটি বছর আগে নেতাজী পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। জুবিলি হলে একটি বিরাট সভা হয়। এই সভাতে নব প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্ট কতটা অগ্রসর হয়েছে তা জানানো হয়। তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণের একটি বছরের মধ্যে তিনি যে অসাধ্য সাধন করেছেন, তা অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। গত এক বছরের কাজের সংক্ষিপ্ত তালিকাঃ—

(১) আমরা 'সার্মগ্রিক সমর প্রস্তুতি'র কর্মতালিকা অনুযায়ী ফৌজ, অর্থ ও নানা দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি।

(২) আধুনিক যুদ্ধের জন্য আমাদের বাহিনীকে শিক্ষিত করেছি ও তাদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বর্ধিত করেছি।

(৩) 'ঝাঁসির রাণী বাহিনী' নামে আমরা একটি নারী বাহিনী গঠন করেছি।

(৪) আমরা 'আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট' গঠন করেছি এবং নয়টি মিত্রশক্তি তা' স্বীকার করেছে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে।

(৫) জাপানীদের আনুকূল্যে আমরা স্বাধীন রাজ্য হিসাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ লাভ করেছি।

(৬) আমরা আমাদের হেড-কোয়ার্টার বর্মাতে এগিয়ে এনেছি এবং ফেব্রুয়ারী মাস থেকে আমরা স্বাধীনতা-যুদ্ধ শুরু করেছি। ২১শে মার্চ আমরা জগতের সামনে জানাতে সক্ষম হয়েছি যে, আমাদের সৈন্যরা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে।

(৭) আমরা সংবাদ ও প্রচার বিভাগের কাজ যথেষ্ট বাড়িয়েছি।

(৮) আমরা 'আজাদ হিন্দ দল' নামে একটি পৃথক দল গঠন করেছি। এদের কাজ হবে স্বাধীন ভারত শাসন ও পুনর্গঠন করা।

(৯) আমরা বর্মাতে আমাদের 'জাতীয় ব্যাংক' স্থাপনা করেছি। আমরা সতন্ত্র মুদ্রা নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছি এবং শীঘ্রই সে মুদ্রা আমাদের হাতে আসবে।

(১০) রণক্ষেত্রে প্রত্যেক অঞ্চলে আমাদের ফৌজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। আমাদের সৈন্যরা শত দুঃখকষ্ট ও বাধা অতিক্রম করে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে ক্রমশঃ ভারতবর্ষের মধ্যে অগ্রসর হচ্ছে।

৯ই জুলাই রেঙ্গুনের বিখ্যাত ধনী হবিবকে 'সেবকে হিন্দ' পদক দেওয়া হয়। তিনি তাঁর সর্বস্ব—কোটি টাকার উপর সম্পত্তি ও গহনা প্রভৃতি সমস্তই নেতাজীকে দান করেন। তিনিই প্রথম 'সেবকে হিন্দ'!

বৃটিশ যে মিথ্যা প্রচার দ্বারা আজাদ হিন্দ ফৌজকে পৃথিবীর সামনে জাপানের তাঁবেদার বলে প্রচার করেছে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। বৃটিশ প্রোপাগাণ্ডার ক্ষমতা কতখানি সে সম্বন্ধে নেতাজীর উক্তি—"গত মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশের প্রোপাগাণ্ডার বিষয় বৃটিশ নিজেই লিপিবদ্ধ করেছে। Ponsonbyর লেখা 'Secret of Crewe House' এবং 'Wartime Falsehood' বই দু'খানাই যথেষ্ট। একজন বৃটিশ জেনারেল ব্রিগেডিয়ার চারটেরিস (Charteris) গত যুদ্ধে এই গুজব রটায় যে, জার্মানরা মৃত সৈনিকদের দেহ থেকে চর্বি সংগ্রহ করেছে। তিনি নিজে জানতেন যে এ কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যুদ্ধের পর

তিনি স্বীকার করেছেন যে, তাঁর এই প্রচার যে লোকের মনে এতটা দৃঢ়মূল হবে তা তিনি আশা করেননি। কিন্তু জগতের সাধারণ ব্যক্তিরা মনে করেছিল যে একজন বৃটিশ জেনারেল মিথ্যা কথা বলতে পারে না, কাজেই এই চাতুরি সফল হয়েছিল।

এই সব প্রচার কৌশল আমাকে মোটেই বিস্মিত করেনি। যারা আমাকে হত্যা করতে পারলে খুশী হতো তাদের পক্ষে এই প্রচারের অর্থ অবোধ্য নয়। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য ও অপমানজনক বিষয় হচ্ছে যে, ১৯৪৪ সালেও এমন ভারতীয় পাওয়া যাচ্ছে যারা সামান্য অর্থের জন্য আত্মবিক্রয় করে এই রকম নোংরা কাজ করে। বৃটিশ যে আমাকে 'কুইস্লিং' 'পুতুল' বলে গালাগালি দেবে এ তো স্বাভাবিক; কিন্তু মিথ্যা প্রচারকার্যের জন্য এখনও তারা মিরজাফর ও উমিচাঁদকে পাবে কেন? এমন কোনও ভারতবাসী নেই যে বিশ্বাস করতে পারে যে, আমি জাপানীর কাছে কিংবা অন্য কোনও বিদেশীর কাছে নিজেকে এবং আমার দেশকে বিক্রি করতে পারি।

"বেশ কিছুদিন থেকে শত্রুপক্ষ প্রচার করছে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপানীদের হাতের পুতুল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা বুঝতে পেরেছে যে এ চাতুরি ঠিক খাটছে না। কারণ প্রত্যেকের মনেই সন্দেহ হয় যে, একটি পুতুল বাহিনী কিভাবে এমন সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছে! তাই অন্য পন্থা তারা গ্রহণ করছে। এখন জানানো হচ্ছে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজ একটি দরিদ্র বাহিনী—তাদের না আছে অস্ত্র, না আছে অন্নবস্ত্র। বৃটিশের পক্ষে ভারতের রক্ত চুষে তার সেনাবাহিনীকে খাওয়ানো পরানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আমাদের মতো বিপ্লবী বাহিনীকে কি অবস্থায় যুদ্ধ করতে হয়, আমাদের সেনা-বাহিনী তা জানে। জগতের প্রত্যেক দেশের মুক্তিফৌজকেই এভাবে যুদ্ধ করতে হয়েছে—আয়ারল্যাণ্ড, ইতালী, রাশিয়া বা অন্য যে কোনও স্থানে। প্রত্যেক স্থানেই সর্বশেষে তাদের জয় হয়েছে, আমরাও জয়ী হবো।

"আর একটি নূতন চাতুরি—আমরা নাকি ইসলাম বিরোধী। এ কথা যে কতবড় মিথ্যা তা সকলেই জানে। আমাদের গভর্ণমেণ্ট, লীগ ও ফৌজে বহু মুসলমান আছেন। আমাদের ফৌজের মুসলিম অফিসারগণ খুব সাধারণ ব্যক্তি নন। তাঁরা নামজাদা বংশের সন্তান এবং দেরাদুন মিলিটারী কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত। কোন মিথ্যাই আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না, জগৎ তাদের বিশ্বাস করবে না!—"

২১শে আগস্ট নেতাজী আদেশ জারী করলেন যে, ভীষণ বর্ষা হওয়াতে নানা অসুবিধার জন্য আপাতত আমাদের আক্রমণ বন্ধ থাকবে। পুনরায় আক্রমণের জন্য যেন সকলেই প্রস্তুত থাকে।

১৯৪৫ সালের ২৪শে এপ্রিল তিনি রেঙ্গুন শহর পরিত্যাগ করেন। সেদিন নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে তিনি সকলের কাছে বিদায় গ্রহণ করেন।

"শেষদিনের বিশেষ হুকুমনামা"

—"আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর অফিসার ও সেনাগণ!

যে বর্মাদেশে তোমরা ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে বহু বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করেছ ও এখনও করছো, আমি অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে সেই বর্মাদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি। ইম্ফল এবং বর্মাতে আমরা আমাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম অভিযানে পরাজিত হয়েছি। কিন্তু এটি সবেমাত্র প্রথম অভিযান; এখনও আমাদের অনেক যুদ্ধ করতে হবে। আমি আশাবাদী, কোন কারণেই নিজেকে পরাজিত স্বীকার করবো না। ইম্ফলে, আরাকানের জঙ্গলে ও পর্বতে, তৈলখনি ও বর্মার অন্যান্য অঞ্চলে, তোমাদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের কাহিনী স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসে চিরদিন জাগ্রত থাকবে।

"সহকর্মিগণ! অবস্থা আজ বড়ই সংকটপূর্ণ। আমি তোমাদের শুধু একটি আদেশই দিতে পারি, যদি তোমাদের পরাজয় স্বীকার করতেই হয় তবে বীরের মতোই তা স্বীকার করো। সম্মান ও নিয়মানুবর্তিতার আইন মান্য করো। ভারতবর্ষের ভাবী বংশধরেরা স্বাধীনভাবেই জন্মগ্রহণ করবে, গোলাম হয়ে নয়, তার কারণ তোমাদের চরম বলিদান তোমাদের নামকে গৌরবান্বিত করবে এবং তারা সগর্বে জগৎকে জানাবে যে, তাদের পূর্বপুরুষেরা মণিপুর, আসাম এবং বর্মাতে যুদ্ধ করে ভাগ্যবিপর্যয়ে পরাজিত হয়েছে। বর্তমানে সাফল্যলাভ না হলেও তোমরাই ভবিষ্যৎ সফলতা ও গৌরবের পথ তৈরী করে দিও।

"ভারতের স্বাধীনতায় আজও আমার অখন্ড বিশ্বাস আছে। আজ আমি আমাদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা, আমাদের জাতীয় সম্মান এবং ভারতীয় যোদ্ধাদের বিশেষ সুনাম তোমাদের যোগ্যহস্তে অর্পণ করে যাচ্ছি। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, তোমরা —ভারতীয় মুক্তি-ফৌজের অগ্রদূত—জাতীয় সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য সর্বস্ব, এমন কি তোমাদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারবে। তোমাদের এই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যেন অন্যান্য অঞ্চলস্থ তোমাদের সাথীরাও অনুপ্রাণিত হতে পারে।

"যদি আমার নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবার ক্ষমতা থাকতো তবে আমি এই বিপদের দিনে তোমাদের সাথী হয়ে পরাজয়ের সব দুঃখ ও গ্লানি একসঙ্গে ভাগ করে নিতাম। কিন্তু মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারের পরামর্শ অনুসারে আমি বর্মাদেশ ত্যাগ করছি, যার দ্বারা আমি ভবিষ্যতে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবো। ভারতের ভিতরে এবং পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের আমি বেশ ভালোভাবেই জানি বলেই বলছি যে, তারা সকল অবস্থাতেই যুদ্ধ করবে, আর তোমাদের এই মহান দান কখনই ব্যর্থ হবে না। আমার নিজের বিষয়ে এইটুকুই বলতে পারি, ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে আমি যে শপথ গ্রহণ করেছি সেই শপথ অনুযায়ী কাজ করবো এবং সাধ্যমতো আটত্রিশ কোটি স্বদেশবাসীর সেবা করবো ও শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। সর্বশেষে আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরাও আমার মতো আশাবাদী হও এবং আমার মতো

বিশ্বাস করে যে, অন্ধকার রাতের পরেই ভোরের আলো ফুটে ওঠে। ভারত স্বাধীন হবেই এবং সেদিন বেশী দূরে নয়।

"ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। ইন্‌ে দ, আজাদ হিন্দ্‌ জিন্দাবাদ—"

জয় হিন্দ
স্বাঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু